দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ২১ সংখ্যা।। ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬।। ৫ মাঘ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ৫ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৯ জানুয়ারি - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

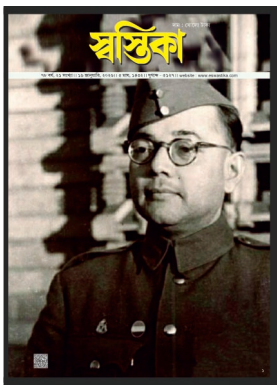

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫

কলির সন্ধ্যে তাই 'ঘৃণ্য'মূলের ব্যালট খাওয়া থেকে শুরু করে ফাইল চুরি চলছে : তস্কর গ্রাসে পশ্চিমবঙ্গ
□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

প্যাক প্যাক পাকড়াও □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

নরেন্দ্রনাথ দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দ) আদর্শে নতুন ভারত গঠনের রূপকার নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী □ কিশোর বর্মন □ ৮

'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র ঢক্কানিনাদ হলো ১৫ বছরে তৃণমূল সরকারের অপকর্ম ঢাকার মরিয়া প্রয়াস □ কৌটিল্য □ ১০

সুভাষচন্দ্র বসু ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুই মেরু □ পিন্টু সান্যাল □ ১১

বিবাহের বার্তা প্রচার নেতাজীর চরিত্র হননের অপচেষ্টা
□ কল্যাণ গৌতম □ ১৪

সুভাষ ঘরে ফিরলেন না কেন? □ রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় □ ১৭

জাতীয় একাত্মতা ও মোক্ষলাভের মাঘমেলা
□ দুর্গাপদ ঘোষ □ ২৩

দেবী সরস্বতী স্বরূপ, বৈচিত্র্য, বিশ্ববিজয় □ শ্রী প্রলয় নন্দী-৩১

বিদ্যাদেবী সরস্বতী □ সপ্তর্ষি ঘোষ-৩৩

সালোকসংশ্লেষেরও দেবী সরস্বতী □ কল্যাণ গৌতম-৩৩

হরপ্পার সমকালীন প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর প্রাচীন পাণ্ডুরাজার ঢিবি □ দেবাশিস চৌধুরী-৩৪

নেতাজীর প্রত্যাবর্তন রুখতে চরিত্র হননের নীলনকশা
□ ড. জয়ন্ত চৌধুরী □ ৩৫

বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো মৌন কেন? □ সুদীপনারায়ণ ঘোষ □ ৩৭

ভারতের প্রতিবেশী দেশের রক্তে শাহজালাল
□ শ্যামলকান্তি মজুমদার □ ৩৯

কেনিয়ার পথে শুরু এক নতুন অধ্যায় বিদেশে হিন্দু সংগঠনের বীজ বপন □ মানস রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৪৩

আইপ্যাক কর্তার বাড়ি থেকে 'সবুজ ফাইল' নিয়ে কেন পালালেন মমতা? □ প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য □ ৪৭

গল্পকথায় ডাক্তারজী □ সংকলক— বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৫০

নিয়মিত বিভাগ

অঙ্গনা-২১ □ সুস্বাস্থ্য ২২ □ সমাবেশ সমাচার ২৭-৩০
□ নবাঙ্কুর ৪০-৪১ □ রঙ্গম ৪৯

প্রকাশিত হবে ২৬ জানুয়ারি ২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৬ জানুয়ারি ২০২৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সাধারণতন্ত্র দিবস

সাধারণতন্ত্র দিবস ভারতের স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠান দিন। এইদিন থেকেই দেশের শাসনব্যবস্থায় ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হয়। স্বাধীনতা দিবসের মতোই এই দিনটিও জাতীয় জীবনে একটি গৌরবময় দিন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় ভারতীয় সংবিধানের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করবেন বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক পুলকনারায়ণ ধর, ডা: মধুসূদন পাল, অভিজিৎ চক্রবর্তী, দেবশিস লাহিড়ী, শ্রীনিবাসজী, লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০/ টাকা (মোট ২৮০০/) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০/ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আপোশহীন সৈনিক

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোশহীন সৈনিক তিনি। শুধু সৈনিক নন, তিনি সেনাপতি, সেনানায়ক। রীতিমতো সেনাবাহিনী লইয়া ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার রণহুংকার ছিল 'দিল্লি চলো'। তাহার পূর্বে বিদেশের মাটিতে আর এক ভারতীয় বীর বি প্লবী রাসবিহারী বসুর সহিত মিলিত হইয়া স্বাধীন ভারত সরকার এবং ভারতের মুক্তিবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। সেই সরকারের তিনি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। ভারতভূমির আন্দামান-নিকোবরকে ব্রিটিশ দখলমুক্ত করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন শহিদ দ্বীপ ও স্বরাজ দ্বীপ। উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুরের মৈরাঙে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিতপতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন। তিনি পরাধীন ভারতবাসীকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলন। দেশে অবস্থানকালেই তিনি স্বাধীন ভারত পরিচালনার রূপরেখা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব' ধ্বনি ভারতবাসীর রক্তে অগ্নিস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাপান ও জার্মানি সর্বপ্রকার সহায়তা করিলেও ভারতের কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা তাঁহার চরম বিরোধিতা করিয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ লইয়া আগ্রসর হইতেছিলেন তখন স্বয়ং জওহরলাল নেহরু তাঁহার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কমিউনিস্টরা তাঁহাকে 'কুইসলিং' এবং জাপান ও জার্মানির এজেন্ট বলিয়া অপপ্রচার করিয়াছিল। তাহারা তাহাদের পিপলস্ ওয়ার পত্রিকায় নেতাজীর নানা ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়া তাঁহাকে অপমানে বিদ্ধ করিয়াছিল। কংগ্রেস কোনোদিনই নেতাজীকে সহ্য করিতে পারে নাই। স্বদেশে অবস্থানকালেই কংগ্রেস তাঁহাকে জাতীয় রাজনীতি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। কিন্তু তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী না থাকিয়া দেশত্যাগ করিয়া মহাবিপ্লবী রাসবিহারীর সহিত মিলিত হইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনপূর্বক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বুকে তিনি ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পারিপার্শ্বিক কারণে তাঁহার অভিযান সফল না হইলেও তাঁহার কারণেই যে ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হইয়াছে, একথা পরবর্তীতে স্বয়ং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীও স্বীকার করিয়াছেন। কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা তাঁহার বিরোধিতা করিলেও তিনি প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে স্থান করিয়া লইয়াছেন। ২০০৪ সালে বিবিসি বাংলা কর্তৃক একটি সমীক্ষায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

দেশে অবস্থানকালেই তাঁহার প্রখর দেশাত্মবোধের পরিচয় দেশবাসী পাইয়াছিল। বাল্যাবস্থায় তাঁহাকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাশ। তাঁহার জীবনের রূপরেখা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। একথা নেতাজী স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অকৃত্রিম দেশপ্রেমের পরিচয় পাইয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে 'দেশনায়ক' উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাসের দেশ নৃত্যনাট্যটি তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উৎসর্গপত্রে বিশ্বকবি লিখিয়াছেন, 'স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে তাসের দেশ নৃত্যনাটিকা উৎসর্গ করলুম।' সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর উদ্দেশে বলিয়াছিলেন, 'পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হইবার চেয়ে বড়ো সম্মান ও গৌরবের বিষয় অন্য কিছুতে নাই।' জাতির দুর্ভাগ্য যে,এরকম সৈনিক তথা সেনাপতির চিত্র স্বাধীন ভারতে কোনো সৈন্যাবাস কিংবা পুলিশ থানায় না রাখিবার আদেশ জারি করিয়াছিল নেহেরু পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু তাহাই নহে, দেশবাসীর হৃদয় হইতে নেতাজীর গগনচুম্বী জনপ্রিয়তাকে ম্লান করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বিবাহ রটনার ন্যায় গর্হিত কার্যও করিয়াছে কংগ্রেস। দেশের স্বাধীনতার পর দীর্ঘ কংগ্রেসি শাসনে নেতাজীকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মানটুকুও প্রদান করে নাই তাহারা। ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে, পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের যাবতীয় পাপকার্যের স্খালন করিতে উদ্যোগী হইয়াছে নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। কয়েক বৎসর পূর্বেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লা হইতে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলিয়া সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারতবাসীর আশা, নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের উদ্‌ঘাটন-সহ তাঁহার বিরুদ্ধে যাবতীয় চক্রান্ত ও অপমানের যবনিকা বর্তমান ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় উন্মোচিত হইবে।

সুভাষিতম্

নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু / লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা / ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।। (ভর্তৃহরি নীতিশতক)

অর্থ ঃ নীতিবাগীশরা নিন্দা অথবা প্রশংসা করুক, ধনসম্পদ আসুক অথবা চলে যাক, মৃত্যু আজই হোক অথবা পরেই হোক, বুদ্ধিমান লোকেরা ন্যায়ের পথ থেকে বিচলিত হন না।

কলির সন্ধ্যে তাই 'ঘৃণ্য'মূলের ব্যালট খাওয়া থেকে শুরু করে ফাইল চুরি চলছে

তস্কর গ্রাসে পশ্চিমবঙ্গ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

তস্কর আর ভৃত্যতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক দলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক ও সাংসদদের জন্য প্রথমটি প্রযোজ্য। এই রাজ্যের আমলাতন্ত্রের জন্য দ্বিতীয়টি মানানসই। বিশেষ ক্ষেত্রে অমাত্যদের 'গোরু' বলেছিলেন চাণক্য। রাজ্যের বিগত পঞ্চায়েত ভোটের সময় 'রাজ্যপাট'-এর প্রতিবেদনে তা উঠে এসেছিল। 'ঘৃণ্য'মূল সরকারের কর্ণকুহরে তা প্রবেশ করেনি। এ রাজ্যের কিছু পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তা নতুন করে চাণক্যের গোরু হয়েছে। 'ঘৃণ্য'মূল সরকারকে ধোঁকা দিয়ে এক দালাল ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত সঙ্গী হয়েছিলেন উঁচু পদের অমাত্য। শাস্তি হিসেবে অকিঞ্চিৎ দপ্তরে তার ঠাঁই হয়। লোকভবন তার বিরুদ্ধে চরবৃত্তির অভিযোগ আনে। গোরু, বালি, কয়লা, সোনা পাচারের পর রাজ্যে বেআইনিভাবে ফাইল সরানোর সংস্কৃতিও চালু করল 'ঘৃণ্য'মূল সরকার। রাজ্য ভোটের আগে আর কোন জিনিস নতুনভাবে চুরি হয় সেটাই এখন দেখার।

পঞ্চায়েত ভোটে একজন 'ঘৃণ্য'মূল সমর্থক ব্যালট চিবিয়ে খেয়েছিল। রাজ্যের মান-মর্যাদা ও সম্মান অনেকদিন আগেই খুইয়ে দিয়েছে এ রাজ্যের শাসককুল। খারাপের শুরুর সঙ্গে শেষও হয়। কখন কীভাবে তার চেষ্টা চলছে। ফিনিশিং লাইন দেখা গিয়েছে। 'ঘৃণ্য'মূলের রাজত্ব শেষ হবে বলেই ধরা হচ্ছে। না হলে তা দেখা যেত না। ২০২১ ও ২০২৪-এর নির্বাচনে তৃণমূলের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে রাজ্য বিজেপি দু'কদম আগে এক কদম পিছের লড়াই শুরু করে। সংযত প্রতিবাদের লাইনে মানুষের দুয়ারে তাদের বার্তা পৌঁছানোই হয় পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির লক্ষ্য। তাতে সাপও মরে, লাঠিও ভাঙে না। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বামফ্রন্ট আমলে বিরোধী নেত্রী হিসেবে ঝোড়ো ইনিংস খেলতেন। তাতে বিদেশি বাম বিচলিত হয়নি। তা জানত যে তা নাটুকেপনা। তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফসল হয়ে রাজ্যের ক্ষমতায় আসেন তৃণমূলনেত্রী। পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাককে তদন্তের হাত থেকে বাঁচাতে তিনি অনৈতিক কাজ করতে পিছপা হননি। যদিও আইপ্যাক জানিয়েছে তারা নতমস্তকে এই তদন্তে সহায়তা করবে। সরকারি কাজে বাধা দেওয়া যে দণ্ডনীয় অপরাধ, ছ'বারের সাংসদ এবং তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী তা না বোঝার মতো শিশু নন। ১৫ বছর ধরে দুর্নীতির মুখ হয়ে ওঠায় মনে হয় সে নাটকের ড্রপ সিন এবার পড়ে গিয়েছে। আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈন জন্মসূত্রে বাঙ্গালি নন। তাই বাঙ্গালি অস্মিতার তাস খেলতে পারেননি তৃণমূলনেত্রী। 'আবার জিতবে বাংলা', ভোটের ছড়া, গানের সুর তাই কেটে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর অনৈতিক ও রাজনৈতিক নাটুকেপনা রাজ্যের মানুষ আগেই দেখেছিলেন। বর্তমানে জামিনে থাকা রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ পদাধিকারী রাজীব কুমারকে বাঁচাতে একদা তিনি ধর্নায় বসে কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছিলেন। প্রণব মুখোপাধ্যায়কে বলতে শুনেছি কোনটা নাটক হবে আর কোনটা ভোট ক্যাচিং সেটা তৃণমূলনেত্রীর থেকে ভালো কেউ বোঝে না। সেই ট্র্যাডিশন চলেছে। কংগ্রেসকে ভোলেননি তৃণমূলনেত্রী।

এখনকার বিরোধী লড়াইয়ের কায়দা পাল্টেছে। সুনীতির বাইরে থাকলে যে কোনো সরকার দুর্নীতির দাস হয়ে যায়। পতনের রাস্তা তৈরি হয়। তাই তাকে সরাতে আর ঝোড়ো আন্দোলন লাগে না। তৃণমূলনেত্রী যখন যুব কংগ্রেস নেত্রী এবং রাজ্যের বিরোধী নেত্রী ছিলেন, সেই সময় সোশ্যাল বা ডিজিটাল মিডিয়া ছিল না। তাই লড়াইয়ের নাটকীয়তা সর্বসমক্ষে ধরা পড়ত না। 'ঘৃণ্য'মূলের শেষ লাইনটা রাজ্যের মানুষ খুঁজে পাবেই। নীচ লোকের হাতে ক্ষমতা আর অর্থ আসা উচিত নয়। তাদের বন্ধু করাও উচিত নয়। রাজ্যের মানুষের সে বোধ রয়েছে। তবে তিন দশক করে কংগ্রেস আর বিদেশি বামকে ক্ষমতায় রাখার দীর্ঘসূত্রিতা রাজ্যের অনেকটাই ক্ষতি করেছে। সে বদহজম নিয়ে তারা তৃণমূলকে ক্ষমতায় রেখেছে।

২০২৪-এর ভোটে সারা দেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও পরবর্তী পর্যায়ে পাওয়ার প্লে বা ঝোড়ো ব্যাটিং করে পাঁচ রাজ্যে ক্ষমতায় আসে ভারতীয় জনতা পার্টি। তাই তাদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের ভোট জয় কেবল সময়ের অপেক্ষা। ইন্দিরা গান্ধী থেকে জয়ললিতা ও করুণানিধি হয়ে হেমন্ত সোরেন আর কেজরিওয়াল পর্যন্ত যে বিষ রেখা তৈরি হয়েছিল, সেই ট্র্যাডিশন বয়ে নিয়ে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। তফাত একটাই, এবং তফাতটা আরও খারাপ। এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিগত দুর্নীতির লিখিত অভিযোগ নেই। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অপরাধীকে আড়াল করার মৌখিক অভিযোগ রয়েছে। আইপ্যাককে ঘিরে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই প্রথম লিখিত অভিযোগ হলো। এতদিন যা ছিল মুখোশের আড়ালে তা এলো বাইরে। তাই তস্কর গ্রাসে থাকা রাজ্যের এবার মুক্তির সময় এসেছে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

প্যাক প্যাক পাকড়াও

ফাইল লোপাটেষু দিদি,

বড়ো কষ্ট বুঝলেন, বড়োই কষ্ট। আমার নয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের। সত্যি বলছি দিদি, তিনি এখন বড়োই কষ্টে রয়েছেন। কলকাতার লাউডন স্ট্রিটে আইপ্যাক কর্তা প্রতীক জৈনের বাড়িতে আপনি যখন ফাইল চুরি করতে গিয়েছিলেন তখন রাজীবও তো ফেঁসে গিয়েছেন। কিন্তু দিদি, এটা কি চুরি!

চুরি মানে গোপনে কারও জিনিস হাতিয়ে নেওয়া। কিন্তু আপনি তো সেটা করেননি। আপনি বীরাঙ্গনার মতো গেছেন, ফাইল, ল্যাপটপ, ফোন আর কী কী সব তুলে নিয়ে চলে এসেছেন। আইপ্যাকের অফিস থেকেও তাই করেছেন। সবার সামনে, ক্যামেরা সাক্ষী রেখে, গাড়িবোঝাই মাল সরিয়েছেন। এটাকে তো দিদি ডাকাতি বলে। বন্দুক ঠেকিয়ে করেছেন নাকি! আমি জানি, সেটা করেননি। আপনার সাহসের প্রশংসা করতেই হবে।

ইডি প্রতীক জৈনের বাড়িতে গিয়েছিল সকাল ৬টা নাগাদ। এরপর সাড়ে দশটা নাগাদ শেক্সপিয়র সরণী থানার একজন পুলিশ যান। ঢুকতে পারেননি। এরপর ডিসি সাউথ ডিভিশন প্রিয়ব্রত রায় সেখানে যান। কেন্দ্রীয় বাহিনী তাঁকেও ঢুকতে দেয়নি। এরপর কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা যান। এর পরেই আপনি ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীর দলবল নিয়ে পৌঁছে যান। সটান ঢুকে পড়েন। ইডি অফিসার ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কর্মীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বাধা দিতেও ভুলে যান। এর কিছু পরে পৌঁছান রাজীব কুমার। শুনলাম তখন প্রতীককে একটি চেয়ারে বসিয়ে জেরা করা হচ্ছিল। তখন আপনি চিলচিৎকার করে ল্যাপটপ চাইছেন, এই সময়ে রাজীব কুমার ইডি কর্তাকে গ্রেপ্তার করবেন বলে হুমকি দেন। ইডি কর্তা একটু অন্যমনস্ক হয়ে যান। আর সেই সুযোগেই দিদি নাকি আপনি ল্যাপটপটা কেড়ে নেন। এই যে আপনার বীরত্ব সেটা না আমার মনে হয়, স্কুলে ছেলে-মেয়েদের সাহসিকতার পাঠ দেওয়ার জন্য জানানো দরকার। আমি কি দিদি গোটা কাহিনি লিখে দেব? আপনার নাম দেব 'মহীয়সী মমতা'। বেশ হবে কিন্তু দিদি!

এবার বলি দিদি, রাজীব দাদার কষ্টের ব্যাপারটা। ইডির অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার (সিপি) মনোজ ভার্মা এবং বিপুল সংখ্যক পুলিশবাহিনী ভেতরে জোর করে প্রবেশ করে। তদন্তকারীদের ভয় দেখানো, আটকে রাখা, গুরুত্বপূর্ণ নথি, মোবাইল ফোন, হার্ড ডিস্ক, ল্যাপটপ কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তুলেছে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আরও দাবি, সরকারি কর্মচারীর কাজে বাধা, চুরি, ডাকাতি, বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, নিছক তদন্তে বাধা নয়, ডাকাতির অভিযোগ তুলেও আদালতে গিয়েছে ইডি। মুখ্যমন্ত্রী নাকি ইডির নিজস্ব কিছু জিনিসও হাতিয়ে নেন। এটাও মারাত্মক অভিযোগ।

প্রায় ১,৭৪২ কোটি টাকার আর্থিক লেন-দেনের মামলায় তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। যার একটা অংশ গোয়ায় ভোটে ব্যবহার হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই তদন্তে বাধা দেওয়ার জন্য মামলায় আপনার সঙ্গে রাজীব দাদার নামও রয়েছে।

আর মাত্র কয়েকটা দিন চাকরি রয়েছে রাজীব দাদার। গোটা কেরিয়ারে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উঠেছে। আপনার কথায় তিনি এমন অনেক কিছুই করেছেন যার জন্য তিনি সমালোচিত। সারদা কেলেঙ্কারির তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগও রয়েছে। সে তদন্ত চলছে।

যুবভারতীতে মেসিকাণ্ডে রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তা হলেও রাজীব দাদাকে আপনি শোকজ করে মানুষের ক্ষোভ নিরসন করতে চেয়েছেন। তারপরেই সেই তদন্তের কী হলো কেউ জানে না। সে সব ম্যানেজ করা যায়। কিন্তু একেবারে অবসরের আগে এই যে ডাকাতির মামলা তা তো মারাত্মক চেহারা নেবে। পেনশন-সহ সব প্রাপ্য আটকে যেতে পারে। তাঁর গোটা কেরিয়ার আপনার কথা শোনার পরও যে এইভাবে ফাঁসিয়ে দেবেন সেটা নাকি রাজীব দাদা ভাবতেও পারেননি। নাকি হতে পারে জেনেও প্রিয় ম্যাডামকে অবিশ্বাস করতে মন চায়নি। আসলে রাজীব দাদা ভেবেছিলেন, রাখে মুখ্যমন্ত্রী তো মারে কে! কিন্তু আসলে, মারে হরি তো রাখে কে? □

যুবভারতীতে মেসিকাণ্ডে রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তা হলেও রাজীব দাদাকে আপনি শোকজ করে মানুষের ক্ষোভ নিরসন করতে চেয়েছেন। তারপরেই সেই তদন্তের কী হলো কেউ জানে না। সে সব ম্যানেজ করা যায়। কিন্তু একেবারে অবসরের আগে এই যে ডাকাতির মামলা তা তো মারাত্মক চেহারা নেবে। পেনশন-সহ সব প্রাপ্য আটকে যেতে পারে রাজীব দাদার।

অতিথি কলম

কিশোর বর্মন

নরেন্দ্রনাথ দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দ) আদর্শে নতুন ভারত গঠনের রূপকার নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী

ভারত আজ কেবল ইতিহাসের উত্তরাধিকার বহনকারী দেশ নয়, ভারত আজ ভবিষ্যতের দিশারি। মানবতার আলোকবর্তিকা হাতে বিশ্বগুরুর পথে অগ্রসরমান এক নবভারত।

ভারতের ইতিহাসে কিছু মানুষের আবির্ভাব কেবল ঘটনামাত্র নয়, তা যেন ইতিহাসের অন্তর্নিহিত আহ্বানে সাড়া দেওয়া এক অদ্ভুত যোগাযোগ। নরেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে স্বামী বিবেকানন্দ এবং অতি সাধারণ চা-বিক্রেতা পরিবার থেকে উঠে আসা নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী দু'জনেই ভারতের ভিন্ন প্রান্তে, ভিন্ন শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের জীবনদর্শন, লক্ষ্য ও জাতীয় ভাবনা এক গভীর স্রোতে মিলিত।

শুধু নামের মিল নয়, ভারতের বিকাশে এক ধারাবাহিক যাত্রা। ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পরবর্তীকালে তিনি পরিচিত হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ নামে, যিনি বঙ্গের নবজাগরণের এক প্রেরণাপুরুষও। অন্যদিকে, ১৯৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর স্বাধীনতার পর নবগঠিত ভারতের পশ্চিম প্রান্তের গুজরাট রাজ্যের মেহসানা জেলার ভাদনগর শহরে এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী।

একজন জন্মেছিলেন পরাধীন ভারতের জাতিকে জাগ্রত করতে, আর একজন জন্মেছেন স্বাধীন ভারতের সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ প্রদান করতে। দু'জনের জন্ম ভারতের দুই প্রান্তে হলেও লক্ষ্য তাঁদের অভিন্ন— ভারতকে নিজের শক্তিতে দাঁড় করাতে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের দুর্বলতার মূল খুঁজে পেয়েছিলেন জাতির আত্মবিশ্বাসের অভাবের মধ্যে। তাই তিনি বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন. 'ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।' তাঁর কাছে ধর্ম মানে ছিল কর্ম, সেবা ও মানবমুক্তি। তিনি বিশ্বাস করতেন, যতদিন না দেশের প্রতিটি মানুষ শিক্ষিত, সুস্থ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হচ্ছে, ততদিন ভারতের মুক্তি অসম্পূর্ণ।

১৯৯৩ সালে চিকোগো ধর্ম মহাসভায় তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা ভারতকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে প্রচিষ্ঠিত করেছিল কিন্তু তাঁর অন্তরের বেদনা ছিল, ভারত নিজের শক্তিকে চিনতে পারছে না। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন— চরিত্রবান ও সাহসী যুবসমাজ দরিদ্রের সেবাকে জাতীয় ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক শক্তি ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ে এক নতুন ভারত গঠন করবে। স্বামীজী ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা, তিনি ভারতের আত্মাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন।

নরেন্দ্র মোদী হলেন তার রূপকার, যিনি স্বামীজীর আত্মজাগরণের স্বপ্নকে রাষ্ট্রভাবনা ও শাসন পরিচালনায় রূপ দিয়েছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ আমার জীবন ও কর্মচিন্তার অন্যতম প্রধান অনুপ্রেরণা।' এ যেন ইতিহাসের এক অদ্ভুত সমাপতন। এক নরেন্দ্র বাণী রেখে গেছেন, আর এক নরেন্দ্র সেই বাণীকে বাস্তব রূপ প্রদান করে চলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো, তাহলেই বিশ্ব তোমার ওপর বিশ্বাস রাখবে।' এই বাণীরই আধুনিক প্রশাসনিক রূপ হলো 'আত্মনির্ভর ভারত।'

আজ ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। প্রতিরক্ষা উৎপাদনে দেশীয় অংশগ্রহণ আজ ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছেছে, ডিজিটাল পেমেন্টে বিশ্বে অগ্রণী হয়েছে ভারত, স্টার্টআপ কর্মসংস্কৃতিতে বিশ্বে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। এসবল কেবল সংখ্যা নয়, এসব ভারতের হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাসের পুনরুদ্ধার। দরিদ্র সেবা— 'দরিদ্রনারায়ণ' থেকে 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'। স্বামীজী বলতেন, দরিদ্ররাই হলেন প্রকৃত নারায়ণ। এই ভাবনারই বাস্তবায়ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার পরিচালনায়। জনধন যোজনায় ৫০ কোটির বেশি মানুষকে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আনা, উজ্জ্বলা যোজনায় ১০ কোটির বেশি গরিব পরিবারে রান্নার গ্যাস সংযোগ, বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত, কোটি কোটি গৃহহীন পরিবারের মাথার ছাদ দেবার জন্যে পিএম আবাস যোজনা, কোটি কোটি গরিব মানুষকে বিনামূল্যে রেশন, সৌভাগ্য যোজনায় ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী

৮০ কোটি মানুষকে প্রধানমন্ত্রী অন্নপূর্ণা যোজনায় বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী প্রদান, জলজীবন মিশনে প্রত্যেক বাড়িতে নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়া। এই উন্নয়ন পরিকল্পনা কোনো করুণা নয়, এটি দেশের মানুষের সম্মান ও ক্ষমতায়নের জন্য সেবা।

স্বামীজী বলেছিলেন শারীরিক ও মানসিক বলে বলীয়ান হতে, অর্থাৎ কর্মশক্তি ও আত্মনির্মাণ। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার বাস্তবায়ন করে চলেছেন— স্কিল ইন্ডিয়া, জাতীয় শিক্ষানীতি, নারী সংরক্ষণ বিল, তিনতালাক প্রথার বিলোপ, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া, মেক ইন ভারত-এর মাধ্যমে। এসবই স্বামীজীর চেতনার আধুনিক বাস্তবায়ন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতকে বিশ্বগুরু হিসেবে কল্পনা করেছিলেন অহংকারে নয়, মানবতার আলোকবর্তিকা হিসেবে। তিনি ভারতকে কখনো সামরিক শক্তি বা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমে বিশ্বগুরু হওয়ার আহ্বান জানাননি। তাঁর কাছে বিশ্বগুরুর অর্থ ছিল মানবতার কল্যাণে পথপ্রদর্শক হওয়া— যেখানে জ্ঞান, সহনশীলতা ও করুণা একসূত্রে আবদ্ধ। তিনি বলেছিলেন, ভারতের মহত্ত্ব তার আধ্যাত্মিক শক্তিতে, যা সমগ্র মানবজাতিকে আলোকিত করতে পারে।' এই দর্শনই আজ বিশ্বরাজনীতিতে নতুন অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতা পাচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে।

মোদীজীর নেতৃত্বে জি-২০'র সভাপতিত্ব কেবল একটি কূটনৈতিক দায়িত্ব ছিল না, এটি ছিল বিশ্ব উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার এক ঐতিহাসিক সুযোগ। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব এক পরিবার, এই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনকে তিনি বিশ্বনীতির কেন্দ্রে স্থাপন করেন। ভারত প্রথমবারের মতো উন্নয়নকে কেবল জিডিপি-র গণ্ডিতে নয়, মানব কল্যাণ ও উন্নয়নযজ্ঞে জনগণের অন্তর্ভুক্তির পরিমাপে বিচার করার আহ্বান জানান। গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠকে বিশ্বমঞ্চে এক সম্মানজনক অবস্থানে তুলে ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্যা ও সম্ভাবনাকে জি-২০ আলোচনার মূল স্রোতে নিয়ে আসেন।

এ ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ, যেখানে ভারত অনুসারী নয়, পথপ্রদর্শক। বসুধৈব কুটুম্বকম্ এই আধ্যাত্মিক দর্শনকে নরেন্দ্র মোদী বিশ্বনীতির নীতিবাক্যে পরিণত করেছেন। এটি কোনো স্লোগান নয়, এটি ভারতের সভ্যতাগত দর্শন। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবনাকেই বিশ্বধর্মের মূল বলে মনে করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, যে ধর্ম মানুষে মানুষে বিভেদ শেখায় তা ধর্ম নয়। নরেন্দ্র মোদীর কূটনীতিতে এই দর্শন বাস্তব রূপ পেয়েছে যুদ্ধ ও সংঘাতের সময় শান্তি আহ্বানকারী হিসেবে। করোনা মহামারীকালে 'ভ্যাকসিন মৈত্রী' কর্মসূচির মাধ্যমে মানবিক সহায়তা প্রদান এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষায় 'লাইফ স্টাইল ফর এনভায়রনমেন্ট' (LiFE) উদ্যোগে তা প্রতিফলিত। এভাবে ভারত বিশ্বকে শেখাচ্ছে, উন্নয়ন মানে দায়িত্ববোধ।

স্বামী বিবেকানন্দ যোগ ও বেদান্তকে বিশ্বদরবারে পরিচিত করিয়েছিলেন। তাঁর চিকাগো বক্তৃতার পর পাশ্চাত্যে ভারতীয় দর্শনের প্রতি আগ্রহ নতুন দিশা পায়। নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে ২১ জুন দিনটিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ আন্তর্জাতিক যোগদিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিশ্বময় ভারতীয় যোগ হেয়ে উঠেছে শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক শান্তি ও সামগ্রিক জীবনদর্শনের প্রতীক। এটি কেবল সংস্কৃতির প্রসার নয়, এটি ভারতের সফট্ পাওয়ারের এক শক্তিশালী প্রকাশ। নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন, এই শতাব্দী ভারতের শতাব্দী। এটি কোনো রাজনৈতিক স্লোগান নয়, এটি একটি আত্মবিশ্বাসী জাতির ঘোষণা। বর্তমান ভারত এমন এক ভারত যে নিজের ঐতিহ্যে গর্বিত, যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রণী, যে বিশ্বকে শোষণ নয়, সমাধান দিতে চায়। এই ঘোষণার মধ্যেই ধ্বনিত হয় স্বামীজীর সেই আহ্বান, 'বিশ্ব আজ ভারতের কাছ থেকে কিছু পেতে প্রস্তুত, ভারতকে কেবল নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।'

বিশ্বমঞ্চে আজ ভারতের উত্থান কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এটি স্বামী বিবেকানন্দের বপন করে যাওয়া চেতনার দীর্ঘ ফলন। তা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে চলছে সুসংহত বাস্তবায়ন। ভারত আজ কেবল ইতিহাসের উত্তরাধিকার বহনকারী দেশ নয়, ভারত আজ ভবিষ্যতের দিশারি। মানবতার আলোকবর্তিকা হাতে বিশ্বগুরুর পথে অগ্রসরমান এক নবভারত। স্বামী বিবেকানন্দ বীজ বপন করেছিলেন ভারতীয় আত্মচেতনার, নরেন্দ্র মোদী সেই বীজে জলসিঞ্চন করে এক নবভারতের নির্মাণ করে চলেছেন। একজন ভাবনার ভারত, একজন নির্মাণের ভারত। দুই নরেন্দ্র কিন্তু একই অধ্যায়। ইতিহাসের এক অদ্ভুত কিন্তু অর্থবহ মিলন।

[লেখক ত্রিপুরা সরকারের উচ্চশিক্ষা, পঞ্চায়েত সাধারণ প্রশাসন (রাজনৈতিক) দপ্তরের মন্ত্রী]

শোক সংবাদ

দক্ষিণ বীরভূম জেলার দুবরাজপুর খণ্ডের যশপুর মণ্ডলের মণ্ডল প্রমুখ কৌশিক স্বর্ণকারের ঠাকুর্দা কানাইলাল দাস স্বর্ণকার গত ২৪ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃতুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

‘কেন্দ্রীয় বঞ্চনা’র ঢক্কানিনাদ হলো ১৫ বছরে তৃণমূল সরকারের অপকর্ম ঢাকার মরিয়া প্রয়াস

নিজেদের অপদার্থতা ও অকর্মণ্যতা ঢাকতে ‘কেন্দ্রীয় বঞ্চনা’র অপপ্রচার যে ৩৪ বছর পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম অস্ত্র ছিল সেই বিষয়টি স্বস্তিকার গত সংখ্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। সেই অপপ্রচারের ধারাবাহিকতায় ২০১১ থেকে রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারও একইভাবে হাতিয়ার করেছে ‘কেন্দ্রীয় বঞ্চনা’র অলীক তত্ত্বকে।

২০১৪-র পর তাদের এই অপপ্রচার এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেস দলের এহেন দাবির পিছনে কতখানি সত্যতা রয়েছে সেই বিষয়টি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যেই আজ এই নিবন্ধের অবতারণা। প্রশ্ন হলো ২০১৪ পরবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্র কি আদৌ পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চনা করেছে? দেখা যাক তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র ঠিক কী কী দিয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে তৃণমূল সরকার কতটা ব্যর্থ হয়েছে এবং অসহযোগিতা করেছে।

(১) কলকাতা মেট্রোর জন্য ১০০ শতাংশ অর্থ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাকি সব রাজ্যের মেট্রো প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ৫০ বা ৬০ শতাংশ। কলকাতা মেট্রো প্রকল্প রূপায়ণ রছে রেল মন্ত্রক; বাকি সব রাজ্য কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্বের কোম্পানি বানিয়ে কাজ করছে। বাকি সব রাজ্যে যেহেতু রাজ্য সরকার মেট্রো প্রকল্পগুলির দায় নিচ্ছে, তাই ঝড়ের গতিতে কাজ এগোচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মেট্রো প্রকল্পে যেহেতু রাজ্য সরকারের কোনো বিনিয়োগ নেই, সেহেতু বিভিন্ন স্থানে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর নিয়ে চূড়ান্ত অসহযোগিতা করছে রাজ্য। তাই গত ১৫ বছরে ১৫টি নতুন মেট্রো স্টেশন যোগ হয়নি কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কে। (২) **রেল ব্রিজ :** রেলপথ ও ট্রেনের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন রেল ক্রসিং তুলে দিয়ে রেল ওভারব্রিজ নির্মাণ। সাধারণত এই ধরনের ব্রিজে রেল কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ভাগ দেয় এবং রাজ্যও নিজের ভাগ দেয়। এই ব্যাপারে সব রাজ্যেই এক নিয়ম। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও এই খরচের দায় নেন। কিন্তু তৃণমূলনেত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই খরচের দায় নেওয়া বন্ধ করে দিলে রাজ্য জুড়ে লেভেল ক্রসিং তুলে ব্রিজ বানানো বন্ধ হয়ে যায়। ট্রেনের সংখ্যা না বাড়ায় বিভিন্ন লাইনের ট্রেনে ভিড় বাড়তে থাকে। শহরতলির মানুষ প্রাণ হাতে নিয়ে ট্রেনে যাতায়াত শুরু করে। শেষে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য বাধ্য হয়ে এই খাতে ১০০ শতাংশ আর্থিক দায় বহন করে কেন্দ্র। (৩) গত ৫৫ বছরে রাজ্যে কোনো নতুন বন্দর নির্মিত হয়নি। ওদিকে বাংলাদেশ ও ওড়িশা একের পর এক বন্দর নির্মাণ করে চলেছে। এমতাবস্থায়, ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রক থেকে ৪০ হাজার কোটি টাকার গভীর সমুদ্র বন্দরের অনুমতি দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গকে। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ঘটা করে তার নামকরণ করেন ‘ভোর সাগর বন্দর’। তারপরই শুরু হয় সম্পূর্ণ অসহযোগিতা। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শুরুই করতে দেওয়া হয়নি এই প্রকল্প। ফলে লাভবান হয় বাংলাদেশের বন্দর শিল্পের। (৪) উত্তর ভারত-সহ পশ্চিমবঙ্গকে দেশের শিল্প মানচিত্রে আবার নিয়ে আসতে ‘অমৃতসর-কলকাতা শিল্প করিডোর’-এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করে কেন্দ্র। কিন্তু রাজ্য জমি দেয়নি। এমনকী তৃণমূল শাসিত রাজ্যের শিল্পবিরোধী তকমার জন্য বামফ্রন্ট আমলে জমি অধিগ্রহণ করা পানাগড়, রঘুনাথপুর, খড়্গপুর ও শালবনীতেও কোনো বিনিয়োগ আসেনি। (৫) ইস্ট কোস্ট শিল্প করিডোর একই কাহিনি। (৬) দ্রুত পণ্য পরিবহণের জন্য একমাত্র রাস্তা হলো ‘ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর’। মুম্বই-হাওড়া ফ্রেট করিডোর আটকে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে। রাজ্য জমি দেয়নি। (৭) লুধিয়ানা-ডানকুনি ফ্রেট করিডোর একই কাহিনি। (৮) উত্তরবঙ্গের কৃষকদের বর্ধমান বা হুগলীর কৃষকদের মতো সমৃদ্ধ করতে পারত ‘তিস্তা প্রকল্প’। সেচ প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে এক ফসলি জমিকে তিন ফসলি করে দিলে সারা বছর গ্রামের মানুষের হাতে কাজ থাকে এবং কৃষিজীবীদের আয় বাড়ে প্রায় তিন গুণ। কিন্তু প্রকল্প রূপায়ণের রাজ্যের অনীহার কারণে তিস্তা প্রকল্পের ৯০ শতাংশ অর্থ ২০১৬-তে কেন্দ্রীয় তহবিলে ফেরত গিয়েছে। (৯) আইলার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা, আইলা বিধ্বস্ত এলাকায় নদীবাঁধ নির্মাণ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার উন্নয়নে ৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে কেন্দ্র। এই জেলা ২০০৮-এ পঞ্চায়েতে পরিবর্তনের কাণ্ডারি এবং সেই সময় থেকে দু’হাত তুলে তৃণমূলকে সমর্থন করে এসেছে। কিন্তু জমি অধিগ্রহণে সমস্যার দোহাই দিয়ে সেই টাকা ফিরিয়ে দেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এরপরে আম্ফান ও যশ নাম নিয়ে ফিরে আসে ভয়ংকর সাইক্লোন। আবার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি, ফসল, গবাদি পশু ইত্যাদি। বিস্তীর্ণ নদীবাঁধ সংস্কারে এখনও নতুনভাবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। (১০) উত্তরবঙ্গ থেকে হলদিয়া বন্দরের সরাসরি সড়ক ও রেল যোগাযোগ নেই। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের পথে এ এক বড়ো বাধা। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক রাজ্যকে এই খাতে ৩ হাজার কোটি টাকা দেয়। কিন্তু জমির কারণে ফেরত যায় সেই অর্থ। এরপর উত্তরবঙ্গের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে এই সড়ক নির্মাণের দায়িত্ব নেয় কেন্দ্র। এই বছর ৬ হাজার কোটি টাকার টেন্ডার ডাকা হয়েছে মোড়গ্রাম, দুর্গাপুর, খড়্গপুর হয়ে হলদিয়া বন্দর যাওয়ার এই সড়ক নির্মাণে। (১১) দ্রুতগতির ইন্টারনেট পরিষেবা তথ্য-প্রযুক্তি শিল্প ও বর্তমান আর্থিক দুনিয়ার ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা। রাজ্যের ইন্টারনেট পরিষেবা দ্রুততর করার লক্ষ্যে হলদিয়ায় সাবমেরিন কেবল্ ল্যান্ডিং স্টেশন প্রকল্পের প্রস্তাব দেয় কেন্দ্র। কিন্তু সেই প্রকল্প বন্ধ করে দেয় তৃণমূল সরকার। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের সফ্‌ট্‌ওয়্যার এবং অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকা সংস্থা ও কর্মীদের কথা ভেবে দীঘায় আবার সেই প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে বিএসএনএল-এর মাধ্যমে। (১২) এছাড়াও জল জীবন মিশন, আবাস যোজনা, গ্রামীণ সড়ক, জেএনএনইউআরএম, এনজিআরবিএ-সহ বহু কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কেন্দ্রের বরাদ্দ হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করতে পারেনি রাজ্য। (১৩) ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান, সুবর্ণরেখা, সিদ্ধেশ্বরী-নুনবিল, দ্বারকেশ্বর-গন্ধেশ্বরী ও তিস্তা সেচ প্রকল্প রাজ্যের চাষিদের জীবন পালটে দিতে পারত। রুখতে পারত বন্যা। কিন্তু রাজ্যের অকর্মণ্যতার কারণে প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয়নি। (১৪) কয়েক বছর আগে সংসদে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় অভিযোগ করেন যে, দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম সড়ক নির্মাণের টাকা দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে। উত্তরে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতীন গড়করী বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি দিলে ১০০ শতাংশ সড়ক সম্প্রসারণ করে দেবে কেন্দ্র’। কিন্তু আজ পর্যন্ত জমি দিতে ব্যর্থ রাজ্য। (১৫) কলকাতা ও বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণে অর্থ বরাদ্দের অঙ্গীকার করে কেন্দ্র। কিন্তু এক্ষেত্রেও জমি দিতে ব্যর্থ রাজ্য। গত ১২ বছর কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে পশ্চিমবঙ্গকে, তার সঠিক ব্যবহার হলে পরিকাঠামো, সিমেন্ট, স্টিল থেকে শুরু করে পরিষেবা, কৃষি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরাসরি যে পরিমাণ বিনিয়োগ হতো তাতে একজন পশ্চিমবঙ্গবাসীকেও পরিযায়ী হতে হতো না; দেশের শিল্প মানচিত্রে স্থান করে নিয়ে হৃতগৌরব ফিরে পেত রাজ্য। □

সুভাষচন্দ্র বসু ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুই মেরু

জাতীয় আন্দোলনের যে দুই পথ সেদিন তৈরি হয়েছিল যার একটি সুভাষচন্দ্রের পথ আর একটি মোহনদাস গান্ধীর পথ। যার একটি যথাক্রমে ভারতীয়ত্বের পথ আর একটি তোষণের পথ— দুই ধারা এখনো গতিশীল। কিন্তু সত্যের সূর্যোদয় ভারতীয়ত্বের পথকে ক্রমশই আলোকিত করছে, সুগম করছে যার দিকনির্দেশনা, তা করছেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র।

পিন্টু সান্যাল

১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ফণীভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি। ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এটলি জানিয়েছিলেন, ভারতীয় সৈন্য ও নৌবাহিনীর ব্রিটেনের প্রতি আনুগত্যের অভাবের জন্যই ইংরেজদের তড়িঘড়ি ভারত ছাড়তে হয়েছিল আর এর পেছনে ছিল সুভাষচন্দ্রের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির কার্যকলাপ। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চক্রবর্তী স্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছিলেন ইংরেজদের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তে গান্ধীজীর প্রভাব কতটা ছিল? উত্তর এসেছিল— m-i-n-i-m-a-l। রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'History of Bengal'-এর প্রকাশককে চিঠিতে এই কথোপকথন সম্পর্কে জানান ফণীভূষণ চক্রবর্তী (তথ্যসূত্র : Bose : An Indian Samurai— GD Bakshi)।

গান্ধীজীর থেকে নিজেকে আলাদা করেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে মতপার্থক্যের মূল্য সুভাষকে দিতে হয়েছে অনেক। পরপর দু'বার সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েও নিজের পছন্দমতো ওয়ার্কিং কমিটি তৈরি করতে পারেননি, কংগ্রেসের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েও নিজের মতো করে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ, বিরোধীদের সঙ্গে লড়াইয়ের রাজনীতির থেকেও বেশি কঠিন দলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে লড়াই করা বিশেষ করে সেখানে, যেখানে 'কাজের মানুষের থেকে কাছের মানুষ বেশি প্রাধান্য পায়।' এর মূল্য সুভাষকে যেমন দিতে হয়েছে ঠিক তেমনি এর খেসারত কয়েক লক্ষ গুণ বিবর্ধিত হয়ে ভারতকে দিতে হয়েছে 'দেশ বিভাজন'-এর রূপে। আর ভারতের প্রজন্মের পর প্রজন্ম এখনো দিয়ে যাচ্ছে।

যিনি বলেছিলেন দেশ বিভাজন হলে তার মৃতদেহের উপর দিয়ে হবে, তাঁর চোখের সামনেই লক্ষ লক্ষ মৃতদেহের পাহাড়ের চূড়ায় উঠেই দেশ বিভাজনকে স্বাধীনতার শর্ত হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় প্রয়োজন ছিল দ্বৈত চরিত্রবিহীন আপোশহীন এক নেতার, কিন্তু কোথায় তিনি? তিনি তখন অন্তহীন রহস্যের মধ্যে হারিয়ে গেছেন।

অহিংসাই যদি আন্দোলনের মূলমন্ত্র হয়, তাহলে যে ইংরেজ বিশ্ববিজয়ী হতে চেয়ে ভারতীয়দের যুদ্ধে ব্যবহার করতে চাইছে তার সহযোগিতা কী করে অহিংসা হয়? এই প্রশ্নের কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর না পেয়েই সুভাষচন্দ্র নিজের পথ আলাদা করে নিয়েছিলেন। প্রশ্ন তারাই করতে পারেন যাদের 'কাছের মানুষ' হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু যারা 'কাছের মানুষ' হতে চেয়েছিলেন তারাই নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন, ক্ষমতা ভোগ করতে পেরেছেন আর সুভাষ হয়েছেন কখনো 'নির্বাসিত', কখনো 'যুদ্ধাপরাধী'।

সুভাষচন্দ্র বসু আর মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীর মতপার্থক্য প্রথম সাক্ষাৎকার থেকেই শুরু হয়ে যায়। দেশবন্ধুর ডাকে ইংরেজের চাকরি ত্যাগ করে বম্বেতে গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম আলাপেই যে প্রশ্নগুলো করেছিলেন সুভাষ সেই প্রশ্নগুলোর যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর না পেলেও সেই সময় ছিল চিত্তরঞ্জন দাশ, বাল গঙ্গাধর তিলকের মতো নেতাদের প্রেরণা। কিন্তু প্রথমে বাল গঙ্গাধর তিলক আর পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অকালপ্রয়াণের পর গান্ধীজীর সমতুল্য আর কেউ থাকলো না। সুভাষের কথায়, 'In spite of the democratic constitution of the Indian National Congress, at Nagpur, Mr. Gandhi emerged as the virtual Dictator of the Congress'। সার্বজনিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অহিংসার এক রূপ বলা যায় কিন্তু অহিংসার পূজারির এহেন ব্যবহার যে সুভাষের বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

অভিভাবকহীন সুভাষের মনের কথাগুলো ধীরে ধীরে বের হতে লাগলো। সে সময় ইংরেজদের ত্রাস 'বোস' ইউরোপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ইউরোপে একদিকে চলছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন জোগাড়ের কাজ আর অন্যদিকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমসাময়িক ইতিহাসকে বিশ্বের সামনে নিয়ে আসার কাজ। লন্ডনে ১৯৩৫ সালের ১৭ জানুয়ারি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকার তাঁর রচিত বইটিকে নিষিদ্ধ করতে সময় নষ্ট করেনি। সাধারণ ভারতীয়

পাঠকদের হাতে বইটি এক দশকেরও বেশি সময় পরে পৌঁছায়। নোবেলজয়ী ফরাসি নাট্যকার রোমাঁ রোলাঁ সুভাষচন্দ্র বসুর লেখা 'The Indian Struggle' বইটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন...

'What you say about the dualism in the part played by Gandhi and in his nature made a deep impression on me. Evidently this very dualism makes his personality so original...I am admiring your firm political sense'।

গান্ধীজীর অহিংস নীতি তাঁকে বহির্বিশ্বে দেবতার আসনে বসিয়েছিল কিন্তু সুভাষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে গান্ধীজীর সঠিক মূল্যায়নের প্রশংসা করেছিলেন রোমাঁ রোলাঁ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গেলে প্রতি পৃষ্ঠায় গান্ধীজীর নাম আসাই স্বাভাবিক যেমনটি এসেছে সুভাষচন্দ্রের কথায়।

কিন্তু এই স্মৃতিচারণ এসেছে এক সহকর্মী হিসেবে, এক অনুগত কর্মী হিসেবে, ভবিষ্যতের কর্মপন্থার যৌক্তিকতা বুঝতে চাওয়া এক প্রশ্নকর্তা হিসেবে আর পরিকল্পনা ও প্রাপ্তির পার্থক্য মূল্যায়নকারী এক সাধারণ ভারতীয় হিসেবে।

বইটির রিভিউ লিখতে গিয়ে 'The News Chronicle'-এ বেরিয়েছিল— 'His picture of Gandhi is very interesting as an Indian view. It is firmly and convincingly drawn. He does full justice to the marvellous qualities of the saint without condoning in the least the 'Himalayan blunders' of the politician...

অর্থাৎ সমালোচকদের কাছে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে বইটির মূল আকর্ষণ ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গান্ধীজীর কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন। বইটির 'The Role of Mahatma Gandhi in Indian History' অধ্যায়ে গান্ধীজীর বিভিন্ন গুণাবলীর প্রশংসা করে সুভাষের শেষ কথা 'But India's salvation will not be achieved under his leadership'।

সুভাষচন্দ্র অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন কংগ্রেস যদি গান্ধীজীর মতের বিপরীতে হাঁটতে চায় তাহলে গান্ধীজী সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিতে পারেন যেমনটি নিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র। ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত যে সময় চিত্তরঞ্জন দাশ আর সুভাষচন্দ্র বসুর যুগলবন্দি দেখছে ভারত। তার আগে ১৯২১ সালের জুলাই মাসে গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে গান্ধীজীর এক বছরে স্বরাজ এনে দেওয়ার দাবির মধ্যে কোনো যুক্তি খুঁজে পাননি সুভাষচন্দ্র বসু। 'কিন্তু সেই সময় আমি নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে হয়তো আমার বোঝাপড়ারই কোনো ঘাটতি ছিল। তবু আমার যুক্তিবোধ বারবার স্পষ্টভাবে আমাকে জানিয়েছে যে মহাত্মা যে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে দুঃখজনকভাবে সুস্পষ্টতার অভাব ছিল এবং তিনি নিজেও সেই আন্দোলনের ধারাবাহিক পর্যায়গুলি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা রাখতেন না, যা ভারতকে তার বহুল আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। আমি যখন গভীরভাবে বিষণ্ণ ও হতাশ ছিলাম, তখন আমার করণীয়ই-বা কী ছিল? মহাত্মা আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, কলকাতায় পৌঁছেই যেন আমি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কাছে নিজেকে রিপোর্ট করি।'

সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় চতুর্থ হওয়া মস্তিষ্কে গান্ধীজীর পরিকল্পনাকে বাস্তবসম্মত মনে হলো না, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার ভাবনায় ভরা বুক হতাশায় ভরে গেল কিন্তু ভাগ্য ভালো চিত্তরঞ্জন দাশকে পেয়েছিলেন পথপ্রদর্শক ও সমর্থক হিসেবে (By the time our conversation came to an end my mind was made up. I felt that I had found a leader and I meant to follow him. —চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পর্কে)। কিন্তু কংগ্রেস থেকে নিজেকে আলাদা করে নেওয়ার সময় এরকম কোনো ছায়া ছিল না সুভাষের। কংগ্রেসে যে গান্ধীজীর বিপক্ষে বলা সম্ভব নয় এমনকী ভুল করলেও সম্ভব নয় তা অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

''মহাত্মা যদি তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করার মতো অবস্থানে থাকতেন, তবে একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর দ্বারা সংঘটিত বহু গুরুতর ভুল এড়ানো সম্ভব হতো। এই তিন মহান ব্যক্তির মৃত্যুর পর কংগ্রেসের নেতৃত্ব বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে এক নিম্নস্তরে নেমে এসেছে। আজকের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নিঃসন্দেহে ভারতের কয়েকজন উৎকৃষ্ট মানুষের সমন্বয়ে গঠিত— যাঁদের চরিত্র ও সাহস আছে, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের মানসিকতা আছে। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশকেই মূলত বেছে নেওয়া হয়েছে মহাত্মার প্রতি তাঁদের 'অন্ধ' আনুগত্যের কারণে; এবং তাঁদের মধ্যে খুব কমজনই আছেন যাঁদের নিজের মতো করে চিন্তা করার ক্ষমতা আছে, অথবা মহাত্মা যখন ভুল পথে পা বাড়াতে পারেন বলে মনে হয়, তখন তাঁর বিরুদ্ধেও মুখ খুলে বলার ইচ্ছা আছে। এই পরিস্থিতিতে আজকের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা কার্যত এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।'' (পৃষ্ঠা-৬৭)

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কংগ্রেসের ভেতরের অগণতান্ত্রিকতার সেই শুরুর কি শেষ কোনোদিনই হয়নি যার মাশুল দিতে হয়েছিল নেতাজীর সঙ্গে গোটা দেশকে? সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিঠি লিখেছিলেন গান্ধীজীকে (২০ ডিসেম্বর, ১৯৩৯)... 'Owing gravely critical situation all over India and especially in Bengal would urge Congress Working Committee immediately tremove ban against Subhas and invite his cordial co-operation in supreme interest of national unity'।

কিন্তু গান্ধীজীর মন গলেনি। সুভাষচন্দ্র তখন তার কাছে বখাটে ছেলে। কিন্তু এই বখাটে ছেলেই রণাঙ্গন থেকে বেতার বার্তায় 'জাতির জনক' সম্বোধন করে গান্ধীজীর আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু কিন্তু গান্ধীজী বড়লাট লিনলিথগোর সঙ্গে দেখা করার পরে স্পষ্ট জানান— 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা এখন আমি মোটেই ভাবছি না। ইংল্যান্ড বা ফ্রান্স যদি স্বাধীনতা হারায়, তাহলে কী হবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিয়ে?'

সুভাষচন্দ্র স্তম্ভিত! বিশ্বাস করতে পারেননি, এ গান্ধীজীর বিবৃতি। আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে শাসন সংস্কারের পথ থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সরাসরি 'স্বরাজ'-এর লক্ষ্যে যারা চালিত করেছিলেন তাঁরা কারা? শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পালের মতো কংগ্রেসিরা। একদিকে কংগ্রেসকে ধরে রয়েছেন আর অন্যদিকে

তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন সংগ্রামে। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় লেখার জন্য বিপিন চন্দ্র পাল কারারুদ্ধ হয়েছিলেন বলেই ক্ষুদিরাম বসুর মতো বিপ্লবীরা পথে নেমেছিল। একদিকে বঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ— ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীদের গুরুর ভূমিকায়, অন্যদিকে বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রেরণায় মহারাষ্ট্রে তৈরি হচ্ছেন বীর সাভারকার। এমন সময়ই মোহনদাস গান্ধীর ভারতের রাজনৈতিক আকাশে উদয়। লাল-বাল-পাল ত্রয়ীর অনুপস্থিতিতে গীতার বাণীকে সামনে রেখে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার নায়করা নেই, এই সময় শুরু হলো আপোশ-তোষণের মাধ্যমে সবাইকে সঙ্গে পাওয়ার রাজনীতি। এই রাজনীতির সঙ্গে লড়তে হয়েছিল সুভাষচন্দ্র বসুকে—একাকী।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তির জন্য গান্ধীজীর অনড় অবস্থানের জন্য ব্রিটিশদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে দেরি করা, দেশবন্ধুর থেকে বিপরীত অবস্থান নেওয়াকে নেতাজী সমালোচনা করেছেন— 'Ultimately the Mahatma did come round, but by then it was too late. The Government of India, tired of waiting, had changed their mind. The Deshabandhu was beside himself with anger and disgust. The chance of a lifetime, he said, had been lost.'।

শুধু তাই নয়, খিলাফত আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করাকেও তিনি চরম ভুল বলেছেন— 'তৃতীয়ত, ভারতীয় রাজনীতিতে খিলাফত প্রশ্নের অন্তর্ভুক্তি ছিল দুর্ভাগ্যজনক। আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যদি খিলাফতপন্থী মুসলমানরা একটি পৃথক সংগঠন গঠন না করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতেন, তবে এর পরিণতি এতটা অনাকাঙ্ক্ষিত হতো না। সেক্ষেত্রে তুর্কিদের নিজেদের কর্মকাণ্ডের ফলে যখন খিলাফত ইস্যুটি কার্যত অবসানপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন খিলাফতপন্থী মুসলমানরা সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তাবাদীদের সারিতে আত্মসাৎ হয়ে যেতেন। (পৃষ্ঠা-৭৮-৭৯)

খিলাফতের আন্দোলনের মূল্য দিতে হয়েছিল মালাবার অঞ্চলের হিন্দুদের— 'The Moplahs of Malabar were a section of the Moslem community. Their rising was directed against the local Hindus; nevertheless it was also an attack on the Government and as such, caused them considerable anxiety and embarrassment. It has significance also because it was the first incident to loosen Hindu-Moslem unity.' (Page-69)।

চৌরিচৌরার একটিমাত্র ঘটনার জন্য এককভাবে সমগ্র আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন গান্ধীজী, কারও সঙ্গে আলোচনা না করেই। ইতিহাস সচেতক সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষ্যে— 'কেউই বুঝতে পারেনি কেন মহাত্মা চৌরিচৌরার একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে সারা দেশজুড়ে আন্দোলনটিকে শ্বাসরোধ করে বন্ধ করে দিলেন। জনগণের অসন্তোষ আরও তীব্র হয়েছিল, কারণ মহাত্মা বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করেননি, এবং সামগ্রিকভাবে দেশের পরিস্থিতি অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্যের জন্য অত্যন্ত অনুকূল ছিল'।

নেতাজীর 'The Indian Struggle' ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেওয়া এক দেশনায়কের বিবরণ। কিন্তু সেই বিবরণ পড়লে মনে হয় তা স্বাধীনতা আন্দোলনকে সঠিক দিশা দেওয়ার জন্য নেতাজীর লড়াইয়েরও বিবরণ আর সেই লড়াই স্বয়ং গান্ধীজীর সঙ্গেই। গান্ধী-আরউইন চুক্তির ব্যর্থতা সম্পর্কে নেতাজী লিখছেন— 'মহাত্মার অন্ধ অনুসারীরাও পর্যন্ত যখন এই পূর্বাভাসগুলি পড়তেন, তখন অবধারিতভাবেই মন্তব্য করতেন যে তাঁদের নেতা— অর্থাৎ মহাত্মা— সেই সব শর্তে সম্মতি দেবেন, এমনটা কল্পনাও করা যায় না'। (পৃষ্ঠা-২২২)

ব্রিটিশদের দুর্বল সময়ে ভগত সিংহ, রাজগুরুর ফাঁসি রদ করতে গান্ধীজীর ব্যর্থতাও সুভাষচন্দ্র মেনে নিতে পারেননি আর করাচীতে 'All India Naujawan Bharat Sabha'-র সভাপতিত্ব করার সময় স্পষ্টভাবে সমালোচনা করেন। চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সঙ্গে গান্ধীজীর তুলনা এইভাবে করেছেন দেশনায়ক— 'তিনি ছিলেন স্বচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন; তাঁর রাজনৈতিক প্রবৃত্তি ছিল সুস্থ, নির্ভুল ও অব্যর্থ এবং মহাত্মার বিপরীতে তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে নিজে যে ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছেন, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।...দেশবন্ধুর সঙ্গে তুলনা করলে মহাত্মার ভূমিকা মোটেই স্পষ্ট নয়। বহু দিক থেকে তিনি একজন নিখাদ আদর্শবাদী ও দূরদর্শী কল্পনাপ্রবণ মানুষ। আবার অন্যদিক থেকে তিনি একজন চতুর রাজনীতিবিদ। কখনো কখনো তিনি উগ্রপন্থীর মতো অনড় ও একগুঁয়ে; আবার অন্য সময়ে শিশুর মতো আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত। রাজনৈতিক দরকষাকষির জন্য যে প্রবৃত্তি বা বিচারবুদ্ধি একান্ত প্রয়োজন, তার অভাব তাঁর মধ্যে ছিল। যখন সত্যিকারের কোনো দরকষাকষির সুযোগ উপস্থিত হয়েছে— যেমন ১৯২১ সালে, তখন তিনি তুচ্ছ বিষয় আঁকড়ে ধরে থেকেছেন এবং তাতেই সমঝোতার সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে। আবার যখনই তিনি কোনো সমঝোতায় প্রবেশ করেছেন— যেমন আমরা ১৯৩১ সালে দেখব— তিনি নেওয়ার চেয়ে বেশি দিয়ে বসেছেন। মোটের উপর, কূটনীতির ক্ষেত্রে তিনি চতুর ব্রিটিশ রাজনীতিবিদের সঙ্গে তুলনীয় নন"।

কলেজে থাকাকালীন যার কাছে প্রেরণা ছিলেন বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ, যার রাজনৈতিক গুরু আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দ ঘোষের আইনজীবী চিত্তরঞ্জন দাশ, তিনি যে আজীবন বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলবেন তা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব ততদিনে বদল হয়ে গেছে। সুভাষচন্দ্র বসুকে ঘরের ভেতরেই লড়তে হচ্ছে, আর সেই সময় ভারতে আগমন ঘটেছে আর এক বিদেশীয় তত্ত্বের, যাদের কাছে বিপ্লবীরা 'সন্ত্রাসী', 'বন্দে মাতরম্' যাদের মন্ত্র নয়। 'বন্দে মাতরম্'-এর অঙ্গচ্ছেদ দিয়ে শুরু হওয়া তোষণ ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ করলো।

খিলাফতের মতো অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলমঞ্চে আনা শুধু শুরু হলো না, তারপর বিদেশীয় আনুগত্যের দল তৈরি হলো। জাতীয় আন্দোলনের যে দুই পথ সেদিন তৈরি হয়েছিল যার একটি সুভাষচন্দ্রের পথ আর একটি মোহনদাস গান্ধীর পথ। যার একটি যথাক্রমে ভারতীয়ত্বের পথ আর একটি তোষণের পথ— দুই ধারা এখনো গতিশীল। কিন্তু সত্যের সূর্যোদয় ভারতীয়ত্বের পথকে ক্রমশই আলোকিত করছে, সুগম করছে যার দিকনির্দেশনা, তা করছেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। □

বিবাহের বার্তা প্রচার নেতাজীর চরিত্র হননের অপচেষ্টা

কল্যাণ গৌতম

মনে রাখতে হবে, তিনি আধুনিক ভারতের ভীষ্মদেব। তাঁর চরিত্রের বিপ্রতীপে রয়েছে একদল অন্ধকার জগতের মানুষের অনন্ত আনাগোনা, যাদের নানান স্বার্থ, অফুরন্ত লোভ, বিবিধ রাজনৈতিক প্রত্যাশা। পরের কথাটি এই, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর পরিবারের একজন সদস্য হলেও, তিনি আদতে পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন। তিনি অসম্ভব পরাক্রমশালী এক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, এককথায় এক মহান বিশ্বমানব। সুতরাং তাঁকে নিয়ে কথা বলার, তাঁর সম্পর্কে কোনো বিবৃতি দেওয়ার একচেটিয়া ও একচ্ছত্র অধিকার তাঁর পরিবার ও পরবর্তী প্রজন্মেরও থাকতে পারে না।

নারায়ণ সান্যাল 'আমি নেতাজীকে দেখেছি' গ্রন্থের 'কৈফিয়ত' অংশে লিখেছেন, ''নেতাজী 'বিবাহিত' এই অসত্যটা মেনে নেওয়ায় কে কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করেছেন তা গবেষণা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই হিমালয়ান্তিক মিথ্যাচারকে অপসারণ করে নেতাজীর প্রকৃত জীবনী রচিত হয়নি।''

এক নিকষকালো আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার যখন নেতাজী নিজেই, তখন সেই অন্যায়-অশুভ রঙ্গমঞ্চে সমস্ত তথ্য ও তার বিশ্লেষণ একমাত্র 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এবং তদন্তসাপেক্ষে'ই করা উচিত। কারও কল্পিত মতামতের অনুসারী হওয়া উচিত নয় এবং ঋতসত্য মনে করে তাতে অবগাহন করাও অনুচিত। তাই শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বসু পরিবারের পরিবেশিত যাবতীয় বিবৃতি ও বিশ্লেষণকেও ঐতিহাসিক তুল্যমূল্য করেই গ্রহণ অথবা বর্জন করতে হবে এবং জটিলতার পঙ্ক থেকে ঝেড়ে বেছে নিয়ে শব্দের শবব্যবচ্ছেদ ঘরে বিশ্লেষণ করতে বসতে হবে। মনে রাখতে হবে, ষড়যন্ত্রে যেকোনো ঘটনাই ঘটিয়ে দেওয়া সম্ভব এবং তা দিতে পারে পরিকল্পিতভাবে তৈরি করানো কাগজ ও দলিল-দস্তাবেজের সুবাদে।

১৯৪৯ সালের ২২ এপ্রিলের প্রভাতে হিন্দি দৈনিক পত্রিকা 'সন্মার্গ'-এর বেনারস সংস্করণের একটি সংবাদে চমকে উঠলো ভারতবাসী। সংবাদের শিরোনাম ছিল 'নেতাজী কী পত্নী'। তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, এক জার্মান রমণীকে বিয়ে করেছিলেন সুভাষ, তাদের আট বছর বয়সি এক পুত্রসন্তান রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে দেশবাসী বিস্মিত, হতচকিত হলো। এ কী করে সম্ভব! এ কী করে সত্যি হতে পারে!

প্রায় দুই বছর অতিক্রান্ত হবার পর আবারও 'বোমা'! ওই পত্রিকাতেই আবারও খবর প্রকাশিত হলো—সুভাষচন্দ্রের বিবাহ হয় এক জার্মান মহিলার সঙ্গে, রয়েছে তাদের এক কন্যাসন্তানও। লক্ষ্য করা গেল দু'বার দু'রকম খবর—একবার পুত্রসন্তানের কথা এবং আর একবার কন্যাসন্তানের কথা। আশ্চর্যের বিষয় এই, দুই বছরের সংবাদের ব্যবধানেও সন্তানের বয়স আট বছরই রইলো, বাড়লো না। তবে পত্নী হিসাবে জার্মান মহিলাকেই দেখানো হলো। তবে কি নেতাজীর পুত্র ও কন্যা—এই দু'টি সন্তান?

১৯৪৯ সালের ২২ এপ্রিল যদি কোনো সন্তানের বয়স হয় আট, তবে তার জন্ম হতে হবে ১৯৪১ সালে এবং মাতৃগর্ভে সেই ভ্রূণ তৈরি হতে শুরু করবে আনুমানিক আরও ৯ মাস ১০ দিন আগে। অর্থাৎ তার পিতাকে এই জার্মান মাতার সঙ্গে সহবাস-সঙ্গম করতে হবে ১৯৪০ সালের বর্ষা শুরুর সময়ে, জুন-জুলাই মাস নাগাদ। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেসময় অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন ভারতবর্ষে। ১৯৪০ সালের ২ জুলাই তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যায়। ইতিহাস সাক্ষী, ওই দিন দুপুরে সুভাষকে জেলবন্দি করে ব্রিটিশ সরকার। কিছুদিন প্রেসিডেন্সি জেলে থাকার পর তিনি এলগিন রোডে নিজের বাড়িতে গৃহবন্দি হন। অপরদিকে যাকে বলা হবে সুভাষের স্ত্রী, এমেলিয়ে শেঙ্কেল, তিনি সেই সময়ে জার্মানিতে অবস্থান করছেন। অতএব জার্মানিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই গল্প ধোপে টিকবে না বুঝে ষড়যন্ত্রকারীরা আবারও দুই বছর অপেক্ষা করে দ্বিতীয় বোমাটি ফাটালেন একই কাগজে। ষড়যন্ত্রকারীদের গণিতের হিসেব কিছুটা ভুল হয়ে গেছিলো সেদিন। সংবাদকে তাই আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার জন্য এবং ইতিহাসকে ব্যবহার করবার জন্য তাদের পাক্কা দু' বছর অপেক্ষা করতে হলো। না হলে নেতাজীর শুক্রাণু জার্মানিতে পাচার করিয়ে এমেলিয়ের গর্ভসঞ্চার করানো হয়েছে—এমন

কোনো উদ্ভট গল্প অবতারণা করে সেই মিথ্যাকে সত্য করার কষ্টকল্পনা করতে হতো।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে পরিবেশিত বিবাহ-সংবাদের প্রেক্ষিতে উত্তরপ্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা রামগতি গাঙ্গুলি নেতাজীর দাদা শরৎচন্দ্র বসুকে চিঠি লিখলে তিনি উত্তর দিলেন, এই মিথ্যা সংবাদকে উপেক্ষা করতে।

দেশবাসী একটি বড়ো ধাপ্পাবাজির গল্প বুঝতে শুরু করলেন এবার। ক্রমে তারা বুঝলেন এক নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে নেতাজীকে কেন্দ্র করে। দেশপ্রেমের মহান আদর্শকে খানখান করে দিতে চায় কেউ। চুরমার করে দিতে চায় তাঁর অভূতপূর্ব ভাবমূর্তি। তবে কি তাঁর চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করতে নতুন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে স্বার্থান্বেষী আন্তর্জাতিক অপশক্তি। ভারতের মধ্যেই, প্রশাসনের অন্দরমহলেই তার শিকড়? ষড়যন্ত্রটি ঠিক কী, অনুমান করতে শুরু করলেন নেতাজীভক্ত এবং দেশব্রতী মানুষেরা।

দেশপ্রেমী মানুষের মনে এবার প্রশ্ন জাগলো, এই বিবাহের সংবাদ এতদিন কেন কোনো গোয়েন্দা সংস্থার কানে পৌঁছালো না। কেন জার্মান অথবা ইতালি সরকার তা ঘুণাক্ষরেও টের পেল না। জানতে পারলেন না আজাদ হিন্দ ফৌজের কোনো কর্তাব্যক্তিও। এক যৌন কেলেঙ্কারিতে নেতাজীকে জড়িয়ে দেবার চেষ্টা শুরু হলো। দেশব্রতী মানুষ অনুভব করলেন, একজন নিপাট দেশপ্রেমী সম্পর্কে দেশবাসীর শ্রদ্ধার অবনমন ঘটাতেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। দেশবাসীর মনে প্রশ্ন তৈরি হলো, আসলে এর পিছনের জটিল অঙ্ক রয়েছে!

১৯৫৪ সালের ৩১ মার্চ তথাকথিত স্ত্রী এমিলিয়ে শেঙ্কল ভাইস কনসালকে লিখছেন, Sir, I furnish below particulars of my daughter Anita Schenkl Bose who may be registered as the child of an Indian citizen.

Name : Anita

Date of Birth : 29.11.1942

Name and address of father : Subhas Chandra Bose. 1, Woodburn Park, Calcutta (India)

Name and address of mother : Frau Emilie Schenkl, Ferrogasse 24, Vienna XVIII (Austria)

এই চিঠির সঙ্গে দাদা শরৎচন্দ্র বসুকে উদ্দেশ্য করে সুভাষচন্দ্র বসুর বার্লিন থেকে লেখা চিঠি (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩)-কে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন এমিলিয়ে এবং তা 'জাল' বলে দাবি করেছিল তথ্যভিজ্ঞ মহল। চিঠির ভাষা এমনতরো, ''...to-day I am leaving here my news which will reach you in due time. I have married here and a daughter has been born to me. In my absence please show a little affection towards my wife and daughter, as you have done towards me all your life.....''

নেতাজী ও এমিলির বিবাহের কোনো সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি। অনিতার বার্থ সার্টিফিকেটের যে ফোটোকপি পাওয়া যায় তাতে অনিতা ও তার মায়ের নাম দেওয়া আছে যথাক্রমে Anita Brigitte Schenkl এবং Emilie Karoline Schenkl। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে ভাইপো শিশির কুমার বসু এবং অমিয় বসুর দ্বন্দ্বের মধ্যেও অনেক প্রশ্ন উঠে আসে বলে তথ্যভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

ডাঃ মধুসূদন পাল 'বিবাহ গল্পকথা : শয়তানদের গুপ্ত গাথা' গ্রন্থে নেতাজীর বিবাহ-ষড়যন্ত্র নিয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন আউসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি হিসাবে (নিযুক্ত ১৯৯৯ সালে) অনিতার পরিচয় রয়েছে Dr. Anita Brigitte Pfaff. এখানে 'ব্রিজেটি' শব্দটি নিয়েই তাঁর একরাশ প্রশ্ন। 'পাফ' পদবিটি বিবাহসূত্রে পেলেন, তবে 'ব্রিজেটি' শব্দটি কোন পদবির ধারাবাহিকতা? তবে কি 'ব্রিজেটি' পদবিধারী কেউ ছিলেন তাঁর পিতা?

নেতাজীর সঙ্গে এমিলির বিবাহের তারিখের মধ্যেও রয়েছে নানান অসঙ্গতি। এমিলি শেখর বসুকে জানিয়েছেন (সূত্র ডাঃ মধুসূদন পাল ২০২০) ১৯৪১ সাল। ১৯৭৭ সালে কলকাতা হাইকোর্টে ডাঃ শিশির বসুর affidavit অনুযায়ী বিবাহের সাল ১৯৪২। ডাঃ শিশির বোস এবং সুগত বোস সম্পাদিত Netaji Collected Works, Vol. 7(1994) অনুযায়ী এই বিয়ের তারিখ ১৯৩৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর। দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্রের ইউরোপে নির্বাসনের কাল ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে। তবে কি তখনই তাদের বিবাহ হয়েছিল এমনই ইঙ্গিত করলেন তারা?

সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল নেতাজীর বিবাহ-ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করেছেন—

১। সুভাষের যদি বিয়ে হয়েই থাকে তবে সেটি কী জাতের বিয়ে? ধর্মীয় বিয়ে হলে সুভাষকে প্রথমে খ্রিস্টান হতে হয় অথবা শেঙ্কেলকে হিন্দু। এখনও পর্যন্ত কেউ এই দুটি প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত করেননি। ফলে ধর্মীয় বিবাহ হওয়া অসম্ভব। বিয়ে হয়ে থাকলে তা রেজিস্ট্রি বিবাহ, সিভিল ম্যারেজ।

২। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হলে রেজিস্ট্রারের নথিতে লিপিবদ্ধ থাকবে। এখন যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানিতে তা উদ্ধার না হওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এমিলি শেঙ্কেল যখন যুদ্ধের পরেও জীবিত ছিলেন তখন তাঁর কাছে 'ম্যারেজ' সার্টিফিকেট থাকবে না কেন?

৩। সিভিল ম্যারেজে তো সাক্ষী থাকার কথা! কিন্তু দেখা যাচ্ছে শেঙ্কেল নিজে অথবা অন্যান্য রাজনীতিবিদ এই বিয়ের পক্ষে মত প্রকাশ করলেও বিয়েতে উপস্থিত কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর নাম উল্লেখ করছেন না বা সাক্ষীর নাম বলছেন না। বিবাহের কোনও আলোকচিত্রও দেখাতে পারছেন না।

৪। বিয়ে যদি সংঘটিত হয়েই থাকে তাহলে হিটলারের অথবা জার্মান সরকারের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, সেটা জানাও গুরুত্বপূর্ণ কারণ জার্মান সরকারের দৃষ্টিতে এমিলি শেঙ্কেল একজন আর্য বা সুভাষ একজন অনার্য তথা ব্রিটিশ প্রজা সেখানে এত বড়ো একটি ঘটনায় সরকারের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই? এইরকম সিভিল বিবাহের কোনও নজির কি সেই সময়ে ব্যতিক্রম হিসাবে জার্মানির ইতিহাসে আর একটিও আছে?

৫। জার্মানিতে নেতাজীর সামীপ্যে সান্নিধ্যে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সেই সময়, জার্মান কিংবা ভারতীয়, তাঁরা কেউ কখনও বলেননি অথবা লিখে যাননি, কেউ মৌখিকভাবেও বলেননি সুভাষচন্দ্র বিবাহ করেছেন। না নাম্বিয়ার বলেছেন, না ফন ওয়ার্থ, অথবা গিরিজা মুখার্জী কিংবা আবিদ হাসান।

৬। শ্রীমতী শেঙ্কেল কেন বিবাহের পর নিজের পদবি পরিবর্তন করলেন না?

৭। ১৯৪৩—৪৫-এর মধ্যে তো জার্মানি ও জাপানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল, ছিন্ন হয়নি। নেতাজী তখন আইএনএ-র সর্বাধিনায়ক। তাই অ্যাম্ব্যাসির মাধ্যমে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পত্রালাপের সুযোগ

ছিল। অথচ শ্রীমতী শেঙ্কেলের কাছে এমন কোনও চিঠি পাওয়া যায়নি। কেন?

৮। ১৯৪৪-৪৫-এ জার্মানিতে যখন আর.এ.এফ কার্পেট বম্বিং করছে তখনও কি সুভাষচন্দ্র কূটনৈতিক চ্যানেলে কখনও জানতে চেয়েছেন, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা জীবিত আছেন কিনা?

৯। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্টের পর আইএনএ-র বিচারের সময় অথবা ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর শ্রীমতী শেঙ্কেলের কোনও আকুলতা জাগেনি কেন? তিনি তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে কোথাও কোনও প্রশ্ন রাখেননি কেন?

১০। একমাত্র ব্যতিক্রম গান্ধীজীকে লেখা একটি চিঠি—তাতে 'শেঙ্কেল' হিসেবে লিখেছেন, 'মিসেস বসু' হিসেবে নয়। কেন?

১১। শরৎচন্দ্র বসু তথা নেতাজী পরিবারের এবং নেহেরু পরিবার যদি শ্রীমতী শেঙ্কেলকে সুভাষচন্দ্রের স্ত্রী এবং অনিতাকে তাঁর কন্যা বলে মেনেই নেন তবে নেতাজী, ভবনে ছবির গ্যালারিতে নেতাজীর স্ত্রী বা কন্যার আলোকচিত্র প্রদর্শিত হল না কেন?

অভিযোগ উঠেছে, কয়েক দশক ধরে তদানীন্তন ভারত সরকার (নেহরু, প্যাটেল এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার) এবং কিছু বিক্রি হয়ে যাওয়া মিডিয়া-সংবাদপত্র এবং নেতাজী পরিবারের সদস্যরা এমিলি শেঙ্কল এবং অনিতা পাফকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্ত্রী ও কন্যা হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছে। একটি স্বার্থান্বেষী মহল এখনও সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা প্রচলিত গল্পের বিরুদ্ধে কোনও অকাট্য যুক্তি স্বীকার করেন না। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, নেতাজী কি বিয়ে করতে পারবেন না? হ্যাঁ, অবশ্যই পারবেন, কিন্তু বিবাহের নির্দিষ্ট তারিখ বা স্থান অথবা সন্তানের জন্ম সম্পর্কে এত বিভ্রান্তি থাকবে কেন? যারা এমিলি বা অনিতাকে তথাকথিত স্ত্রী বা কন্যা বলে দাবি করলেন, এই বিভ্রান্তিতে তারা কি ব্যর্থ প্রতিপন্ন হলেন না? দাবির সমর্থনে কোনো কার্যকরী কাগজপত্র, রেকর্ড বা নথি এখনও দেখাতে পারলেন না কেন? অভিযোগ ওঠে, তারা এমিলি শেঙ্কলের কোনও বিশেষ মুখ পরিবেশন করতেও পারেননি। বিভিন্ন রেকর্ডে এমিলি শেঙ্কলের আলাদা আলাদা ফোটোগ্রাফ রয়েছে। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র কলকাতার এলগিন রোডের বাড়িতে বন্দি অবস্থা থেকে অলৌকিকভাবে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর ভারতবাসী বার্লিন রেডিয়ো থেকে তার কণ্ঠ শুনতে পেলেন। তিনি হয়ে উঠলেন ভারতীয়দের হৃদয়-সম্রাট। তাঁর কৃতিত্ব, আইএনএ-র বীরগাথা প্রতিটি ভারতীয়কে মন্ত্রমুগ্ধ করল। তারপর তাইহোকু থেকে তথাকথিত মৃত্যুর খবর, লালকেল্লায় আইএনএ সৈন্যদের বিচার সবকিছুই ভারতীয় মননকে তীব্র ঘৃণায় ব্রিটিশ-মানস থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল। সাধারণ মানুষ তাঁকে 'মৃত' বিশ্বাস করতে নারাজ। ব্রিটিশ ও আমেরিকান গোয়েন্দারা তাকে খুঁজতে পৃথিবীর প্রতিটি কোণে তাণ্ডব চালালো। আমরা এমন কিছু কি খুঁজে পেলাম, যেখানে কোনো একজন ব্রিটিশ অথবা আমেরিকান গোয়েন্দা নেতাজীর তথাকথিত বিবাহ সম্পর্কে কোনও প্রতিবেদনে এমন কিছু কি উল্লেখ করলেন যা থেকে বলা যাবে তাঁর একজন স্ত্রী ও পুত্র অথবা কন্যা ছিল? যদি থাকত, তবে কি কোনও রেফারেন্সে, কোনো ইন্টারসেপশন বা রিপোর্টে, কোনও বক্তৃতায়, নেতাজীর পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদে সব গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে লিপিবদ্ধ থাকত না?

এই এমিলি শেঙ্কল যিনি নিজেকে সুভাষচন্দ্রের স্ত্রী বলে দাবি করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে নেহরু এবং নেতাজী পরিবারের কিছু সদস্য কেন এতটা নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি সত্যিই সুভাষের স্ত্রী এবং অনিতা পাফ তাঁর কন্যা? শেঙ্কল অচেনা মুখ তো ছিলেন না। তিনি একদা বিঠলভাই প্যাটেলের (সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দাদা) ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। বিঠলভাই তখন একজন ধনী ব্যক্তি এবং একজন সচিব রাখার ক্ষমতা ছিল তাঁর। সুভাষের সঙ্গে বিঠলভাইয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছিল। তখন সুভাষচন্দ্র বসু নির্বাসিত ছিলেন (১৯৩৩-৩৭) এবং আর্থিকভাবে কোণঠাসা অবস্থায় ছিলেন, তাই তিনি নিজের জন্য একজন পূর্ণকালীন সচিবের খরচ বজায় রাখতে পারেননি। যখন সুভাষ 'The Indian Struggle' বই লিখছিলেন, তখন বিঠল ভাইয়ের নির্দেশে ও সহায়তায় সুভাষকে সাহায্য করেছিলেন শেঙ্কল বইটি টাইপ করে দিয়ে। লেখক সুভাষচন্দ্র বসু তার বইয়ের মুখবন্ধে তা স্বীকারও করেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এতে দোষের কিছু থাকতে পারে না। সমসাময়িক অস্ট্রিয়ায় ইংরেজি জানা স্টেনোগ্রাফার পাওয়া কঠিন ছিল। বিঠলভাই প্যাটেল তাই শেঙ্কলের নাম প্রস্তাব করেন। শেঙ্কল ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা। নিজের বাড়ি থেকে দৈনিক আসতেন, বইয়ের ডিক্টেশন নিতেন এবং ফিরে যেতেন। দু'জনের মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে বলে শোনা যায়নি। মেজদাকে লেখা তথাকথিত 'জালচিঠি'-তেও কিন্তু স্ত্রী ও কন্যার নাম প্রকাশ করা হয়নি। অনেকেই মনে করেন এই চিঠি ভুয়ো। অনেকে বলেন ভুয়ো গল্প রচনায় তৎকালীন বড়োলাট মাউন্টব্যাটেন এবং নেহরুর মতো ব্রিটিশপন্থী ভারতীয় সহযোগীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে এবং একাধিক উদ্দেশ্যে এই অপপ্রচারের কাজ করেছিলেন ও পরবর্তীকালেও চালিয়ে গেছেন। ব্রিটিশ রাজ এবং নেহরুর পক্ষে মানুষকে বিশ্বাস করানো ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিল যে তাদের মহান পবিত্র নেতা নেতাজী তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। পরিস্থিতি নেহরু, গান্ধী, প্যাটেল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সকলের জন্যই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, কারণ নেতাজী যদি ফিরে আসেন তবে তাদের পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা মুশকিল হবে। ভারতীয় জনগণের সঙ্গে কোনো তর্ক করা তখন সম্ভবই হবে না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো উজ্জ্বল দেশনায়ক যতদিন ভারতবাসীর মনে বেঁচে ছিলেন ততদিন অবিভক্ত ভারতের স্বপ্ন তাদের মনে অম্লান ছিল। এই অবিভক্ত ভারতের স্বপ্ন ছিল জিন্না, নেহরু এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য বড়ো বিপদ। সেজন্য ব্রিটিশ ও নেহরু উভয়েরই প্রয়োজন ছিল—(১) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করা। (২) বিমান দুর্ঘটনা এবং বীরের মৃত্যুর মাধ্যমে মিথ্যা কাহিনি সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যাতে এই মহান দেশনায়কের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের মানুষের মন থেকে মুছে যায়। একজন বীরের মৃত্যুকাহিনি তাঁর অনুসারীদের মনকে ক্রমশ হতাশ করে তোলে। সেটাই তো চেয়েছিলেন ষড়যন্ত্রকারীরা। আর এই 'নকল স্ত্রী এবং নকল কন্যা' নেহরু এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে, উভয়ের উদ্দেশ্যকে কার্যকর করে তুলতে সাহায্য করেছিল, এমনটাই অভিযোগ।

গল্পগাছার মাধ্যমে প্রবল-প্রতাপ এক ব্রহ্মচারীর ধার্মিক চরিত্রকেও কলঙ্কিত করা যায়। পিতামহ ভীষ্মের মতো চরিত্রসম্পন্ন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধেও সেই প্রয়াস চলেছিল। নকল স্ত্রীকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভারতীয়দের মনে বিভ্রান্তি তৈরি করার বড়ো আয়োজন তৈরি হলো। যেহেতু বিশ্লেষকরা কোনো পাকাপোক্ত প্রমাণ এখনও পাননি তাঁর বিবাহ সম্পর্কে, তাই এই বিষয় বিশ্বাস বা মন্তব্য কোনোটাই করা কারও উচিত নয়। দিনের শেষে মনে রাখতে হবে, তিনি সুভাষচন্দ্র বসু, এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি প্রয়োজনে নিজের মৃত্যুটাও অভিনয় করে যেতে পারেন। নেতাজী হয়তো সেই প্রতিভা রাখতেন, বিধির বিধান 'জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ' তিনটিই ছাপিয়ে যেতে পারেন তিনি এবং তা তিনি ছাপিয়ে গেছেনও।

সুভাষ ঘরে ফিরলেন না কেন?

রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি কলকাতায় সায়েন্স সিটি প্রেক্ষাগৃহে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উঠে এল সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্য। এদিন সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত এবং সম্প্রতি দেশের উপরাষ্ট্রপতিও একই দাবিতে সোচ্চার হয়ে বলেছেন ১৯৪৫-এর ১৮ আগস্ট তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি।

'নীলকণ্ঠ'কে আদর্শ করে যে ব্যক্তি বলতে পারে— আমার মধ্যে আনন্দের উৎস খুলে গেছে, তাই আমি সংসারের সকল দুঃখ-কষ্ট নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি; যে ব্যক্তি বলতে পারে— আমি সব যন্ত্রণা, ক্লেশ মাথায় তুলে নিচ্ছি, কারণ এর ভিতর দিয়ে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি— সেই ব্যক্তিই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে। আমাদের আজ এই সাধনায় সিদ্ধ হতে হবে, নতুন ভারত যারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে— সারা জীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কাঙাল হয়ে যেতে হবে, প্রতিদানে কিছু না চেয়ে। গভীর মনোযোগী হয়ে 'তরুণের স্বপ্নের' অসমাপ্ত রচনার অবশিষ্ট উপসংহার শেষ না করেই আমার ছোট্ট এক রত্তি কন্যার অকস্মাৎ জিজ্ঞাস্য, বাবা, তুমি কি জানো না নেতাজী কবে মারা গিয়েছিল? ছোট্ট কন্যার এই অপ্রত্যাশিত জিজ্ঞাসা হাড় কাঁপানো মাঘের শীতল দেহে যেন এক লহমায় অশান্ত ক্রোধী সূর্যদেবের বিদ্যুৎ বাণ নিক্ষেপিত হয়ে গেল।

সংবিৎ ফিরে ভাবলাম, সত্যই বটে! এটা কি প্রশাসনিক ব্যর্থতা, না জাতীয় দুর্বলতা, নাকি আমাদের চরম দুর্ভাগ্য। সত্যি বলতে কী, মিথ্যা কখনো বা সযত্নে আমার কন্যার প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। চার দেওয়ালের শীতল নীরবতায় উপর্যুপরি জিজ্ঞাসা ক্রমেই প্রতিফলিত হতে লাগল, মনে হলো এ যেন এক সপাটে চড়। কালের কোনো অমোঘ নিয়মে শিক্ষকতাকে যে কখন পেশা করে ফেলেছি, অসম্ভব নীরবতাই যেন শিক্ষকতা নামক পেশাকে লজ্জিত করে তুললো। দীর্ঘ দিনের শিক্ষকতায় নিযুক্ত থেকেও নিজেকে বড়োই অপরাধী বলে মনে হতে লাগল, আশঙ্কায় বুক ভারী হয়ে প্রমাদ গুনতে লাগলাম, হয়তো চার দেওয়ালের মধ্যে ওর ছোটো বয়সে জিজ্ঞাসা আগামীদিনের জোরালো দাবি না হয়ে ওঠে। আর ঠিক এভাবেই হয়তো যুগের পর যুগ আসবে, শহরে নগরে ধুলো-বালি মাখা কাকপক্ষীর বিষ্ঠার আস্তরণে অমলিন অনাদরে সজ্জিত নেতাজীর মর্মর মূর্তিতে অশিক্ষিত দুর্নীতিবাজ ভেকধারী নেতা-মন্ত্রীর লোক দেখানো কেতাবি ভাষণে গর্জে উঠবে 'নেতাজী তোমায় আমরা ভুলছি না ভুলবো না'। আর শিক্ষিত বাঙ্গালির একটা বড়ো অংশের সরকারি কর্মচারী স্ত্রী-পুত্রের ছোট্ট সংসার নিয়ে সমুদ্রসৈকতে মাংস আর সুরা পানের মত্ত আমেজে তেইশে জানুয়ারির ছুটি কাটাবে। ঠিক এই ভাবেই অতৃপ্ত বাসনায় ক্লান্ত হতে থাকবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম হতাশ, প্রবঞ্চিত, আগামীর উত্তরসূরিদের তাগিদ কমতে কমতে সত্যিই একদিন ইতিহাসের স্মৃতি থেকে মলিন হয়ে যাবে স্বাধীনতা যোদ্ধা মহান এই অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধার প্রকৃত অন্তর্ধান রহস্যের গোপন রসায়নটা।

সুদীর্ঘ আটশো বছরের দীর্ঘ দাসত্বের খোলস ছাড়িয়ে ভারতমাতার যে বীর সন্তানের হাত ধরে এলো ভারতের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, আজ ছিয়াত্তরের বসন্ত পেরিয়েও আমরা তার খোঁজ নিলাম না, অনাদরে বিদায় দিলাম, 'নবকুমারকে বাঘে খাইয়াছে'— ঠিক যেন এই সান্ত্বনায়। দেশ আর রাষ্ট্রের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। দেশ হলো একটি ভৌগোলিক একক। আর বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত একটা সাংস্কৃতিক প্রতিফলন, যেখানে সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর এই ভূমির সঙ্গে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক, তার নাম হলো রাষ্ট্র। যেখানে তৈরি হওয়া এক সুষ্ঠু সাংবিধানিক ব্যবস্থায় প্রত্যাশিত বাধ্যবাধকতা অপেক্ষা জাতির প্রতি কর্তব্য পালনের দায়বদ্ধতা অনেক বেশি তীব্র। কারণ সাংবিধানিক গভীরতায় অন্তর্নিহিত আছে জনগণের প্রতি কর্তব্য পালনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনামা, সরকার যা কখনোই এড়িয়ে যেতে পারে না। অথচ স্বাধীনতার পর সুদীর্ঘ কয়েক দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও দেশনায়কের অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনে পরিলক্ষিত হলো এক নীতিগত ভ্রান্তিবিলাস। উপেক্ষিত হতে থাকল ভারতীয় আবেগ। উড়ে এসে জুড়ে বসা এক নেতা হলেন জাতির জনক, আর সুভাষকে পাঠানো হলো পরিকল্পিত নির্বাসনে। ব্রিটিশের সেফটি ভালভ্ হিসেবে কাজ করা কোনো দলের কোনো নেতা জাতির জনক হতে পারেন না। তাঁর হাজার হাজার বছর আগে থেকেই ভারতীয় জাতি এই ভূখণ্ডে বিদ্যমান। তিনি কী করে এই জাতির পিতা হবেন? কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত তথাকথিত এই জাতির জনকের প্রধান কাজই ছিল সুভাষচন্দ্রকে জাতীয় রাজনীতির মূল কেন্দ্র থেকে দূরে রাখা। তার অহিংস নীতির আড়ালে ছিল গভীর ইংরেজ প্রীতি, আর চতুর ইংরেজও শাসন ক্ষমতায় দমনপীড়নে সমর্থন এবং যাবতীয় দুর্নীতির

সোঁদা গন্ধ পেতেন সেই নেতার তথাকথিত অহিংস আদর্শের অন্দরমহল থেকে। নানান কর্মের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ব্রিটিশ প্রদত্ত কর্তব্যটি তিনি পালন করেছিলেন রাজনীতি থেকে কংগ্রেস থেকে সুভাষকে তাড়িয়ে দিয়ে।

কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের যে সুবর্ণ সুযোগটি লুকিয়ে ছিল, সুভাষচন্দ্র সেটি খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই ১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ সরকারকে চরম পত্র দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিধি বাম, গান্ধী তো ব্রিটিশ ভক্ত, তাই মতাদর্শগত বিরোধ তৈরি হলো সুভাষের সঙ্গে এবং সেই সময় হরিজন পত্রিকায় গান্ধী লিখলেন, ''We don't want our freedom out of Britain's ruin''। সুভাষচন্দ্র চান পূর্ণ স্বরাজ আর গান্ধী চান ডোমিনিয়ন স্টেটাস, অর্থাৎ ইংল্যান্ডের রাজার অধীনে স্বায়ত্ত শাসন। ব্রিটিশ তাঁকে চিনতে একটুও ভুল না করলেও দেশীয় ঐতিহাসিকরা তাঁকে বিচারের কাঠগড়ায় তুলতে ভুলে গেছেন। ভারতের স্বাধীনতা এসেছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে। কিন্তু তার অনেক আগেই আন্দামান-নিকোবরের পোর্টব্লেয়ারের জিমখানার মাঠে ব্রিটিশ শক্তিকে পরাজিত করে ১৯৪৩ সালে ৩০ ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র বসু সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাহলে সেই অর্থে ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করা উচিত ছিল ৩০ ডিসেম্বর, আর সুভাষচন্দ্র বসু হলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী।

না, এতো বড়ো সত্য আগামী প্রজন্মের কাছে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে চায়নি কংগ্রেস। তাই নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার মৃত্যুর তথ্য সামনে আনা হলো নেতাজীর অত্যন্ত দুই সহযোগী তথা ছায়াসঙ্গী হবিবুর রহমান ও শাহনওয়াজ খানকে দিয়ে। জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা হলো এক মনগড়া ইতিহাস। কিন্তু কী আশ্চর্য, একবারও ভেবে দেখা হলো না যে, নেতাজীর শেষ জীবনের একমাত্র বিশ্বস্ত ছায়াসঙ্গী ক্যাপ্টেন হবিবুর রহমান ওই একই বিমানে থেকেও কীভাবে রহস্যজনকভাবে বেঁচে গেলেন। পরে যিনি দেশভাগের পরেই পাকিস্তানের সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসে যুক্ত হন এবং পরে ডিফেন্স সেক্রেটারি তথা পাক অধিকৃত কাশ্মীর প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ করে সেই ভূখণ্ড থেকে কাশ্মীরের রাজা হরি সিংহকে তাড়ালেন। পাকিস্তান সরকার তাঁকে এই সাফল্যের জন্য নানান উপাধিতে ভূষিত করে। ভারত তথা নেতাজী প্রীতি নিয়ে কীভাবে অন্য আর এক বিশ্বস্ত ছায়াসঙ্গী শাহনওয়াজ খান সুবিধাবাদী কংগ্রেসি রাজনীতিতে ঢুকে পড়ে কাদের অঙ্গুলিহেলনে কোন প্রমাণে ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট নেতাজীর মৃত্যু দিনটিকে মান্যতা দিলেন? যে কংগ্রেস সুভাষচন্দ্রকে তাড়িয়ে দিল সেই কংগ্রেসে কোন সুবিধা পেয়ে লোকসভায় চারবার সাংসদ হয়ে সংসদীয় রাজনীতিতে একাধিকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের চেয়ারম্যান পদে তিনি নিযুক্ত হন? ইতিহাস জানতে হবে এবং জানাতে হবে নব প্রজন্মকে।

কোথায়, কী সমস্যা, কাদের স্বার্থ আড়াল করতে সুভাষচন্দ্র বসুর মতো দেশনায়কের অন্তর্ধান রহস্য গোপন করে রাখা হলো? অতীতের দু'টি কমিশন, কয়েকটি তদন্ত কমিটি এবং সাম্প্রতিক অতীতের মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টে উঠে আসা প্রামাণ্য দলিল কাদের অঙ্গুলিহেলনে বিগত সরকার বাহাদুর উপস্থাপন করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল? স্বাধীন ভারতকে সবচেয়ে বেশি শাসন করার সুযোগ পেয়েছিল কংগ্রেস, তাহলে কোন গোপন তথ্য আড়াল করতে এই কাজটি সম্পন্ন করতে দ্বিধাবোধ করল? জওহরলাল নেহরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে কীভাবে ভুলে গেলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের ত্রিশ হাজার বীর বিপ্লবীর আত্মবলিদানের ইতিহাস? তাহলে ধরে নিতে হয়, নিশ্চিত কোনো গোপন দুরভিসন্ধি ছিল এই তদন্তে যা উন্মোচিত হলে কংগ্রেসের পরিবারতান্ত্রিক দেউলিয়াপনার ফাটলটা আরও চওড়া হয়ে যেত?

দীর্ঘ কয়েক দশকের বৈদেশিক শাসনের বিষ নিঃশ্বাসে ভারতবর্ষ জুড়ে যখন অধিষ্ঠিত গ্লানিময় দাসত্ব ব্যবস্থা, নিদারুণ বর্বরতায় ছায়াসুনিবিড় স্নিগ্ধ ভারতীয় অমরাবতী যখন অসম্ভব দহন জ্বালায় দগ্ধীভূত, করুণ মানবাত্মার বিস্তীর্ণ চিতাশয্যার অন্তরালে ভয়ানক প্রকট অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস যখন ভারতীয় সংস্কৃতিকে নগ্ন করে ফেলেছে, সীমাহীন পাশ্চাত্য লাম্পট্যের সুতীব্র আগ্রাসনে জাতীয় কৌলীন্য যখন প্রায় অস্তমিত— এমনই এক সংকটঘন নৈরাশ্যময় সুপ্তিমগ্ন স্থবির ভারতবর্ষে অসহায় পীড়িত অন্নপূর্ণার সন্তানদের নায্য অধিকার ও মর্যাদার অভিষেক ঘটাতে এক দুষ্প্রাপ্য ভারতরত্নের আশ্চর্য আবির্ভাব ঘটেছিল। পরাধীন ভারতের বৃহত্তম সার্বজনীন মাঙ্গলিক চেতনার সফল উত্তরণের উদ্দেশ্যে যার উদাত্ত কণ্ঠে গর্জে উঠেছিল, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'।

প্রবল উন্মাদনায় শুরু হলো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গৌরবময় আবেগতাড়িত অধ্যায়। ভারতাত্মার জ্যোতির্ময় প্রতীক, স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত এই বিগ্রহ দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পর্যুদস্ত করে বিপর্যস্ত ভারতমাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল বহু প্রতিক্ষিত যে স্বাধীনতা, কালের অমোঘ নিয়মে স্বাধীন ভারতের কতিপয় রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীর চরম দুরভিসন্ধিতে পারিবারিক কদর্যের আখ্যানকে গোপন করতে গিয়ে এত বছর পরেও শ্রদ্ধেয় সেনানায়কের প্রাপ্য মর্যাদার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি প্রদানে পরিলক্ষিত হলো দুর্জয় ভ্রান্তিবিলাস। চরম অবহেলা আর নিদারুণ অবমাননায় মহানায়কের এই দুরতিক্রম্য অস্তিত্বকে বন্দি করে রাখা হলো রাস্তায় খোলা মোড়ে ধুলো মাখা মর্মর প্রস্তর খণ্ডে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো দেশনায়কের এহেন অন্তর্ধানের রহস্যকে গোপন করার চক্রান্ত জাতীয় জীবনে এক চরম অকৃতজ্ঞতা।

এখনও কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের অধিষ্ঠান। দেশবাসীর প্রত্যাশা তাঁর সরকারের কাছে অনেক বেশি। অনেক সাহসী পদক্ষেপের তিনি স্রষ্টা। এই প্রধানমন্ত্রীর বজ্রকঠিন অভিভাবকত্বের কাছে শুধু একটাই অনুরোধ, অনুগ্রহপূর্বক এই মহান দেশনায়কের অন্তর্ধান রহস্য অবিলম্বে উন্মোচিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। □

সাইগন থেকে নেতাজীর যাত্রা

বিমানে নয়, সাবমেরিনে রাশিয়ার উদ্দেশে

ডাঃ মধুসূদন পাল

বিগত ৮০ বছর ধরে অসংখ্য গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে একটা ব্যাপার খুব পরিষ্কার যে, তাইওয়ানের বিমান দুর্ঘটনার চিত্রনাট্য সাজানো হয়েছিল নেতাজীর আসল অভিযাত্রা গোপন রাখার জন্য। ১৯৫৬ সালে তাইওয়ান সরকারের তদন্ত রিপোর্ট, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সেজ দাদা সুরেশচন্দ্র বসু প্রকাশিত ডিসেনশিয়েন্ট রিপোর্ট এবং বিচারপতি মনোজ কুমার মুখোপাধ্যায় কমিশনের রিপোর্ট খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, আকাশপথে যাত্রা করলে ব্যাপারটা খুবই কঠিন হয়ে যেত।

বিভিন্ন তথ্য থেকে পুরো বিষয়টা যাচাই করার সময় ডাঃ রামচন্দ্র রাও-এর একটি তথ্য এই প্রতিবেদকের চোখে পড়ে। ১৯৭১ সালে খোসলা কমিশনে তাঁর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। ৫০ পৃষ্ঠার নথির প্রতিটি লাইন পড়া ছাড়াও আরও বেশ কিছু দলিল পড়লে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল সাইগন থেকে সাবমেরিনে, বিমানে নয়। উল্লেখ্য, নেতাজী সুভাষচন্দ্র কীভাবে কোথা থেকে ১৯৪৫-এ তাঁর যাত্রা করেছিলেন, সেই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা বা গবেষণা কিন্তু হয়নি।

এই ব্যাপারে যা যা গবেষণালব্ধ তথ্যপ্রমাণ রয়েছে, সবই মূলত উঠে আসে প্রকাশিত ফাইল থেকে। সত্য উদ্‌ঘাটিত করতে ক্রিটিকাল ইন্টেলিজেন্স এবং ইমোশনাল মাইন্ড দরকার। সব কিছু রয়েছে চোখের সামনে, শুধু সবাইকে সেটা খুঁজে নিতে হবে। একটা অজানা জায়গায় নেতাজী ১৯৪৫-এর আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে চলে গেলেন। আর নেহরু এবং তার সহযোগীরা বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুতত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। যদিও ব্রিটিশ ও আমেরিকানরা গান্ধী-নেহরুকে জানিয়েছিল, তাইহোকুতে কোনো বিমান দুর্ঘটনা ১৮ আগস্ট ১৯৪৫-এ হয়নি। অন্যদিকে ১৯৬৪ সালে সিআইএ নথিতে লেখা হয়, সুভাষচন্দ্র বোস ভারতবর্ষে রয়েছেন এবং তিনি নেহরুর রাজনীতির বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল। এরপর থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যেকোনো রকম খবর প্রকাশ্যে আসার আগেই সরকার থেকে আটকে দেওয়া হতো। এই ধরনের খবর চেপে দেওয়ার কারণ হলো, নেতাজী যে জীবিত ও সক্রিয়, সেটা ভারতবাসী জেনে গেলে তাদের মধ্যে নতুন করে অনুপ্রেরণা তৈরি হবে। নেতাজী সামনে এলে ভারতবাসী জানতে পেরে যাবে, দেশভাগের পিছনে কারা সক্রিয় ছিল। কাদের মদতে দেশভাগ হয়েছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বেঁচে থাকার খবর অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্নকে পুনরায় জাগ্রত করে তুলবে। সুতরাং বছরের পর বছর বিমান দুর্ঘটনাকেই সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা চলতেই থাকল প্রকৃত সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে। যাঁরা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবিত থাকার কথা জানতে পেরেছিলেন এবং ভারতবাসীকে জানাতে চেয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকে রহস্যজনকভাবে মারা গিয়েছেন, কিংবা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই প্রতিবেদকের পক্ষ থেকে মুখার্জি কমিশনে অনেক নথিপত্র জমা দেওয়া হয়।

এই নিবন্ধে একটি গভর্নমেন্ট ফাইলের বিষয়বস্তু প্রথমে তুলে ধরা যাক। মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সের একটি ডিক্লাসিফায়েড ফাইল— GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS, File No.-C/551/6/69/JP। এখানে পার্লামেন্ট ডিসকাশন সম্পর্কে বলা রয়েছে, যেখানে সাংসদ সমর গুহ কিছু প্রশ্ন করেছিলেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের সময়কাল ৪ মার্চ ১৯৬৯। সংবাদপত্রের নাম 'যুগান্তর'। ডিক্লাসিফায়েড ফাইলে 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত সংবাদের ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া রয়েছে। সংবাদের মূল বক্তব্য, নেতাজীর শেষ অভিযাত্রা সিঙ্গাপুর থেকে সাবমেরিনে। অর্থাৎ নেতাজী বিমানে চড়েননি এবং তাইওয়ান বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ সত্য নয়। এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল 'যুগান্তর'-এর এক এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ-এর দ্বারা। এই সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার। এই সংবাদ প্রকাশের সময় তিনি ছিলেন কলকাতা পুলিশ বিভাগে কর্মরত। এছাড়া তিনি একটি তলোয়ার 'যুগান্তর'-এর সাংবাদিককে দেখিয়ে বলেছিলেন যে, সুভাষচন্দ্র সেই তলোয়ার ব্যবহার করতেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, তিনি যখন সিঙ্গাপুরে কর্মরত, তখন এক জাপানি সহযোগীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি জানতে পারেন, সিঙ্গাপুর থেকে অভিযাত্রার সময় নেতাজী সমুদ্র তীরবর্তী একটি বিশেষ স্থান বুকেটিমার কাছে একটি গাড়ি করে গিয়েছিলেন। গাড়ির ড্রাইভার ছিলেন নেতাজীর অন্যতম জাপানি সহচর। নেতাজীর কথামতো সেই সহযোগী সেখানে প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও একজন জাপানি আর্মি অফিসার। যখন দেখলেন, নেতাজী আর ফিরলেন না, তখন তাঁরা নিজেরাই সেই গাড়িতে ফিরে আসেন। আর্মি অফিসারটি আরও বলেছিলেন, পরে তিনি সেই জায়গা নিজেও পরিদর্শন করেছেন। তাঁর মতে, যেহেতু জায়গাটার তিন দিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা, তাই নেতাজীর এই অভিযাত্রা একমাত্র সাবমেরিন যোগেই সম্ভব। তলোয়ারটি

সাইগন এয়ারপোর্টে নেতাজী (১৯৪৫)

গাড়িতেই পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে সেই তলোয়ারটি ভারতে আনা হয়, তৎকালীন ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স অফিসার সুব্রত মুখার্জির সাহায্যে। পরে সুব্রত মুখার্জি যখন ভারতীয় এয়ারফোর্সের এয়ার চিফ মার্শাল, তখন তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু হয়, ৮ নভেম্বর ১৯৬০-এ টোকিয়ো শহরে।

ভারতের ক্ষমতাসীন শক্তিগুলি কোনোভাবেই চাইত না যে, নেতাজী সম্পর্কিত কোনো তথ্য প্রকাশিত হোক। এই ঘটনাটি পার্লামেন্টে আলোচনাও হতো না যদি না অধ্যাপক সমর গুহ সংসদে এই ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তুলতেন। ভারত সরকারের পূর্ব এশিয়ার গোয়েন্দা দপ্তর এবং অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা দপ্তর এই ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়েছিল। কিন্তু নেতাজীর অন্তর্ধান সম্পর্কিত প্রসঙ্গ উঠলে সেই ব্যাপারে প্রাপ্ত তথ্য যেকোনো উপায়ে প্রকাশ্যে আসা বন্ধ করে দেওয়া হতো। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

জাস্টিস খোসলা কমিশন, Vol-I-VII, পৃ. ২৫৬৫-২৫৮৯, তাং ০৯.০৮.১৯৭১-এর রিপোর্টকে মান্যতা দিলে স্বীকার করতে হবে যে, নেতাজীর বিমান সাইগন থেকে রওনা দিয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন হবিবুর রহমান। তুরেন কিংবা তাইহোকুর দিকে কিন্তু যায়নি বিমানটি। সমস্ত আইএনএ (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি) ও আইআইএল (ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ)-এর লোকজনের সামনেই নেতাজী সাইগন থেকে বিমান যাত্রা করেছিলেন হবিবুরকে সঙ্গে নিয়ে। আধঘণ্টা আকাশে থাকার পরে যখন বিমানটি ফিরে এসেছিল সাইগন বিমান বন্দরে, তখন আইএনএ ও আইআইএল-এর সব ব্যক্তিরা বিমান বন্দর থেকে চলে গিয়েছেন। এটা ছিল গোপন পরিকল্পনার অংশ। কিন্তু বিমান বন্দরে ফিরে এসে আইআইএল-এর একজন ব্যক্তিকে দেখে নেতাজী অবাক হন এবং সতর্কতা অবলম্বন করে নিজেকে হবিবুরের থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। আসলে নেতাজীর কাছে সংবাদ ছিল, আইএনএ-র কিছু অফিসার ছিল গুপ্তচর এবং তারা বিভিন্ন সংবাদ বাইরে সরবরাহ করত। তাই তিনি তাদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে চলে যান গোপন জায়গায়, কারণ তাঁর সাবমেরিন তখনও প্রস্তুত ছিল না যাত্রার জন্য। সেই সময় ওই জায়গায় জাপানি ট্রান্সমিটার কাজ করছিল না বলে সমুদ্রে থাকা সংশ্লিষ্ট সাবমেরিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। ফলে সুভাষচন্দ্রের সাবমেরিন যাত্রা কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে গিয়েছিল। 'ট্রান্সফার অফ পাওয়ার এগ্রিমেন্টস্' বা ক্ষমতা হস্তান্তর চুক্তির ৬ নং খণ্ডে লেখা রয়েছে, 'Bose has been seen in Saigon even after few days after the plane crash in Taiwan'।

খোসলা কমিশনে এটা ছিল ডাঃ বি রামচন্দ্র রাও-এর সাবমিশন। তাঁর দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী, সাইগন থেকে হবিবুর রহমান এবং কিছু জাপানি অফিসার আর একটি বিমানে যাত্রা শুরু করেছিলেন তাইওয়ানের দিকে। তাইওয়ানে একটি থিম বানানো হয়েছিল। সেখানে রাখা হয়েছিল একটি জাপানি সামরিক বিমান। অভিযাত্রার পূর্বে তাইওয়ানে একটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমান দেখানোর দরকার ছিল। কিছু পোশাক এবং জুতো যেগুলি নেতাজী ব্যবহার করতেন সেগুলি সেই বিমানে রাখা হয়েছিল। একজন পাইলট নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটি বিমান দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন হারাকিরি-পন্থী, জাপানি সুইসাইডাল স্কোয়াডের একজন। সেই সময় সেই পাইলট বিমানটিকে নিয়ে গিয়ে এয়ারফিল্ডের সীমার মধ্যে ক্র্যাশ করালেন। পরবর্তীকালে সেই পাইলটের কী হয়েছিল তা জানা যায়নি।

অন্য একটি দলিলে সেই পাইলটকে হাসপাতালে ভর্তি দেখানো হয়েছে। অন্য একটি দলিলে তিনি মৃত। কিন্তু কোনো দলিলে তাইওয়ানের কোনো শ্মশান বা কবরখানায় তাঁর শেষ পরিণতির কথা নেই। তাঁর মৃতদেহ জাপানে আনারও কোনো উল্লেখ নেই।

প্রশ্ন, এই সাজানো দুর্ঘটনা ঘটানো হলো কেন?

উত্তরে বলতে হয়, যদি কোনো দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমান না থাকত, তাহলে কি ব্রিটিশ সরকার অথবা আমেরিকান সরকার শুধু শুধু বিমান দুর্ঘটনার গল্প মেনে নিত? আসলে, ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে একটি বিমান দুর্ঘটনার প্রয়োজন ছিল। সাইগনে কী হয়েছিল, সেটা বোঝার আগে তাইওয়ানে কী হয়েছিল সেটা বোঝা দরকার।

প্রশ্ন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই সাজানো গোটা ঘটনাটি সাইগনে কেন মঞ্চস্থ করলেন না?

কারণ, দু'জায়গায় একই মৃতদেহ দেখাতে পারবেন না। একই নাটক দু'টি মঞ্চে মঞ্চস্থ করা যায় না। তার জন্য তাইওয়ানে সাজানো নাটক করা হয়েছিল এবং আসল নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য তাইওয়ানের মতো একটি বিচ্ছিন্ন জায়গা ছিল সবচেয়ে নিরাপদ।

তাইওয়ানের নাটক ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের দেখিয়ে তাদের বোকা বানানো হয়েছিল সাময়িকভাবে। আর সাইগনের গোপন ঘটনা তাঁর নিজের অভিযাত্রার জন্য। তাইওয়ানে সুভাষচন্দ্র ও হবিবুর রহমানকে মাত্র কয়েকজন ছাড়া তেমন কেউ চিনতেন না। অন্যদিকে সাইগনে অনেকেই সুভাষচন্দ্রকে চিনতেন। তাই সেই নাটক মঞ্চস্থ করা সাইগনে সম্ভব ছিল না। এই বিষয়ে হবিবুর রহমানের এক এক জায়গায় এক এক রকম বক্তব্য রয়েছে। কিন্তু তাঁর কোনো বক্তব্যে তুরেনের উল্লেখ ছিল না। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স ফাইলে তুরেনের কথা বলা হয়েছে। সেই কারণে এই প্রতিবেদকের পক্ষ থেকে জাস্টিস মুখার্জি কমিশনের ডিপোজিশনে তুরেনের কথা উল্লেখ করা হয় এবং কমিশনকে হবিবুর রহমানের পরস্পরবিরোধী মন্তব্যের বিবরণও দেখানো হয়।

এইবার আসা যাক, থার্ড ডিগ্রি বার্নড মৃতদেহের ছবি না তোলার কারণ সম্পর্কে। জাপানিদের নিয়ম হলো, কোনো মৃত ব্যক্তির দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিকৃত দেহের ছবি তোলা যাবে না। সেই জন্য থার্ড ডিগ্রি বার্নড মৃতদেহের ছবি তোলা হয়নি। যেহেতু কোনো ছবি নেই, তাই দৃঢ়ভাবে কেউ বলতেও পারবে না যে এই মৃতদেহ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের।

সম্ভবত, নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর অভিযাত্রার জন্য গোপন স্থানে অপেক্ষা করেছিলেন, লিওন প্রচন্ডির তত্ত্বাবধানে। ফরাসিদের ফাইলে পাওয়া যায়, সেই গোপন স্থানটি পরে ফরাসি বাহিনী দখল করে (আগস্ট ১৯৪৫-এর পর)। ওই স্থানে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র খুব চঞ্চল ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছিল। বেড়ে গিয়েছিল দুর্ভাবনাও। ডাঃ রামচন্দ্র রাও তাঁর সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র সেই সময় ঘুমোতে পারতেন না। ডাঃ রামচন্দ্র রাও তাঁকে ওষুধ দেন। ইতিমধ্যে ওয়ারলেস অপারেটর বেতার যোগাযোগ ঠিক করে দিতে পেরেছিলেন। সাবমেরিনের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। সাবমেরিন সমুদ্র উপকূলে এসে পৌঁছায়। সুভাষচন্দ্র সাবমেরিনে অজানা স্থানে রওনা দেন। পুরো পরিকল্পনাটিই ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের। সংশ্লিষ্ট সাবমেরিনে জার্মান স্বস্তিকা চিহ্ন দেখে মনে হয়, সুভাষচন্দ্র জার্মানির সাবমেরিনে চড়েই গোপন অভিযাত্রা করেন।

অবশ্য যাত্রার আগে সাবমেরিন থেকে মুছে দেওয়া হয়েছিল স্বস্তিকা চিহ্নটি। এটিই আসল ক্লু-পয়েন্ট নেতাজীর দ্বিতীয়বার রহস্যজনক অন্তর্ধানের। এ বিষয়ে আগে বিস্তারিত গবেষণার অভাব দেখা যায়। পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সাইগন থেকে নেতাজীর গোপন অভিযাত্রা বিমানে নয়, সাবমেরিনে— রাশিয়ার উদ্দেশ্যে।

(তথ্যসূত্র : এই প্রতিবেদক রচিত পুস্তক *'নেতাজী সুভাষচন্দ্র : কিছু বিতর্ক — কিছু তথ্য', চতুর্থ খণ্ড*)

পরিবারে স্ব-বোধ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব মায়েদের

সুতপা বসাক ভড়

‘ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।’

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত এই গান আমাদের দেশের সম্যক একটি পরিচয় তুলে ধরে আমাদের চিন্তনে, মননে--- যা শাশ্বত; চিরপুরাতন হয়েও চিরনতুন, যুগোপযোগী ও সময়োপযোগী। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে দেখে থাকি। গৌরবময় অতীত, মধ্যবর্তী সময়ে বিদেশি লুণ্ঠনকারী এবং শাসকদের অত্যাচার, বর্তমানে সচেতন নাগরিক, বিশেষত যুবসমাজ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমরা পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী। আমাদের প্রতিষ্ঠাই ভারতকে পুনরায় বিশ্বগুরুর আসনে অভিষিক্ত করবে। এই উদ্যোগে আমাদের মধ্যে অত্যাবশ্যক হলো স্ব-বোধের জাগরণ। এই স্ব-এর অভ্যাস, সাধনা ও আরাধনার দ্বারাই আমরা আমাদের লক্ষ্যের প্রতি ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকব। আমাদের দিনচর্যায় অবশ্যই প্রাথমিকতায় থাকবে স্ব-ভাষা, স্ব-ভূষা, স্ব-ভোজন, স্ব-ভজন (সঙ্গীত), স্ব-ভূষণ, স্ব-ধর্ম ইত্যাদি।

আমাদের পরম্পরার প্রতি দৃক্‌পাত করলে দেখতে পাব যে, এখানে ব্যক্তি নয়, পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অহল্যাবাঈ হোলকর ইন্দোরের মহারানি হয়েই থাকতে পারতেন; স্বামী-সন্তান-পরিজন হারা লোকমাতা কেবলমাত্র নিজ সমাজ, নিজ রাজ্যের জন্য নয়; বরং আপামর মানুষের মঙ্গলার্থে আত্মোৎসর্গ করেছেন। বৃক্ষরোপণ, পুষ্করিণী খনন, কুয়ো খনন, রাজপথ নির্মাণ, শিক্ষা, ব্যবস্থা, মন্দির প্রতিষ্ঠা, জীর্ণমন্দির সংস্কার ইত্যাদি তিনি করেছেন ভারতবর্ষ জুড়ে কেবলমাত্র স্বধর্ম পালনার্থে।

আবার আমরা দেখতে পাই দীর্ঘ বারোশো বছরেরও বেশি সময় সময় ধরে মুসলমান ও ব্রিটিশরা আমাদের ওপর যে অন্যায়, অত্যাচার করেছে, তার ফলে মহিলারা বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যেই থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই ভয়ে আজও আমরা মুসলমানদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করি, তাদের মাদ্রাসায় আমরা আমাদের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের পড়তে পাঠাই না। তাদের সঙ্গে বেশি ওঠা-বসা পছন্দ করা হয় না, অথচ খ্রিস্টানদের সঙ্গে ওঠা-বসার ক্ষেত্রে সেই ব্যবধান থাকে না। তাদের স্কুলে নিজেদের বাড়ির ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হয়ে যাই। তাদের সঙ্গে যথেচ্ছ মেলামেশাকে প্রগতিশীলতার লক্ষণ বলে মনে করা হয়। ২৫ ডিসেম্বর বাড়ি বাড়ি খ্রিস্টমাস ট্রি সাজানো-সহ গির্জায় যাওয়া, পার্কস্ট্রিট ভ্রমণ যেন অতি প্রচলিত হয়ে উঠেছে। আমরা অনেকেই অবলীলায় তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করছি। এরপর পরবর্তী প্রজন্ম কী করবে সেকথা ভাবার সময় এসেছে। আমাদের পরিচিত অনেক পরিবারে বিদেশি সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু হয়েছে। এই বিষয়টিও চিন্তনযোগ্য।

আমাদের সমাজব্যবস্থায় সাধারণত একটি পরিবারের পুরুষেরা অর্থোপার্জনের জন্য দিনের বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকেন। বাড়ির অধিকাংশ মহিলা বাড়ির কাজ ও সন্তান পালনের দায়িত্ব নির্বাহ করে থাকেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাড়ির ভেতর নিজেদের মধ্যে স্ব-ভাষা, স্ব-ভূষা, স্ব-ভোজন, স্ব-ভজন, নিজস্ব পূজাপাঠ, নিত্য সংস্কারাদি বজায় রাখার দায়িত্ব মহিলাদের। সন্তানের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয় প্রধানত মায়ের হাতে। সেজন্য মাকে সচেতন হতে হবে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অবলোকন করে তৈরি করতে হবে নতুন প্রজন্মকে। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উদাহরণ হবেন মা নিজে। স্ব-সাধনার মাধ্যমে বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করবেন তিনি। যথাসম্ভব শিশু বয়স থেকে প্রারম্ভ হয় শিক্ষা। আচার্য চাণক্য বলেছেন—

লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি, দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে, পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।।

আমাদের মধ্যে স্ব-বোধ জাগ্রত হলে আমরাই বাকিদের পথপ্রদর্শন করতে পারব। হাজার হাজার বছর ধরে সনাতন ধর্ম এই পবিত্র ভূমিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, যা প্রাচীনকাল থেকে সমগ্র বিশ্বকে পথ দেখিয়ে এসেছে। এখন সময় এসেছে স্ব-বোধে বলীয়ান হয়ে নিজেদের শক্তিকে চেনা, নতুন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেই শক্তিপ্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টা করা এবং সমগ্র বিশ্বকে সেই শক্তির সঙ্গে পরিচয় করানো, কারণ আমরা অবিনাশী, আমরা সবাই অমৃতের পুত্র। □

বাতের ব্যথা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

আর্থ্রাইটিস বা বাত এখন এক মহামারী। বুড়ো থেকে বুড়ি— সবাই কম-বেশি এর শিকার। তাই প্রতি বছর মে মাসকে বেছে নেওয়া হয়েছে 'বিশ্ব আর্থ্রাইটিস সচেতনতা মাস' হিসেবে। এই মাস জুড়ে চলে বাতজনিত নানান সমস্যা, কুপ্রভাব সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচার এবং এর চিকিৎসা বিষয়ক কর্মসূচি।

বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৩৫ কোটি মানুষের আর্থ্রাইটিস বা বাত রয়েছে। আর ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের শুধু রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস রয়েছে। ৮০ বছরের বেশি যাঁদের বয়স তাঁদের মধ্যে প্রায় ৫৫ শতাংশ আর্থ্রাইটিসের শিকার।

ভারতে অস্টিও-আর্থ্রাইটিস হলো দ্বিতীয় সর্বাধিক বাতজনিত সমস্যা। এখানে অস্টিও-আর্থ্রাইটিসের হার ২২ থেকে ৩৯ শতাংশ। পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বেশিমাত্রায় এই রোগে আক্রান্ত হন। অস্টিও-আর্থ্রাইটিস আক্রান্তদের ৬২ শতাংশই নারী।

মানুষের পঙ্গুত্বের একটি বড়ো কারণ কিন্তু আর্থ্রাইটিস। পরিসংখ্যান বলছে, মোট পঙ্গুত্বের ১৮ শতাংশ এই আর্থ্রাইটিসের জন্যই। ক্রনিক কোনও অসুখে ভুগলে আর্থ্রাইটিসের আশঙ্কা বাড়ে। বাতের কোনো বয়ঃসীমা নেই।

যেকোনো অসুখের পেছনে যখন 'আইটিস' জুড়ে যায় তখন সেটা ইনফ্লামেশন বা প্রদাহকেই বোঝায়। যেমন হেপাটাইটিস, প্যানক্রিয়াটাইটিস, আর্থ্রাইটিস ইত্যাদি। আর্থ্রাইটিস হলো অস্থিসন্ধির প্রদাহ। এই প্রদাহ কী? একাধিক জয়েন্ট বা অস্থিসন্ধি, যেমন— হাঁটু, কবজি, গোড়ালিতে যখন ফোলাভাব আসে, লালচে হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়, ব্যথা হয়, জ্বালাভাব বা প্রদাহ তৈরি হয় তখন সেটাকেই আর্থ্রাইটিস বলে। কিছু আর্থ্রাইটিস বয়স বাড়লে বেশি হয়। আর কিছু আর্থ্রাইটিস যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমাটোসাস ইত্যাদি হলো অটোইমিউন রোগ। যা যেকোনো বয়সের মানুষের হতে পারে। ১০০টিরও বেশি আর্থ্রাইটিস রয়েছে। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস যার মধ্যে সবচেয়ে কমন অটোইমিউন ধরন।

অস্টিও-আর্থ্রাইটিস :

অস্টিও-আর্থ্রাইটিস কার্টিলেজ ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে হয়, কার্টিলেজ হলো হাড়ের প্রান্তগুলিকে ঢেকে রাখার একটি নরম এবং পিচ্ছিল টিস্যু। এই কার্টিলেজ ক্ষয়ে গেলে হাড়ের প্রান্তগুলি সরাসরি একে অপরের সঙ্গে ঘষা লাগে, ফলে জয়েন্টগুলোতে ব্যথা ও প্রদাহ দেখা দেয়। সাধারণ মানুষ আর্থ্রাইটিসকে রোগ ভেবে ভুল করে থাকেন। আর্থ্রাইটিস আদতে কোনো রোগ নয়। অতিরিক্ত ওজন হয়ে গেলে অস্থিসন্ধিতে চাপ পড়ে ফলে আর্থ্রাইটিস হতে পারে। এছাড়া, বার্ধক্যজনিত কারণেও আর্থ্রাইটিস হয়। এই রোগের কোনো প্রতিকার নেই। কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শে যথাযথ নিয়ম মানলে বা ওষুধ খেলে এই ব্যথা অনেকটাই লাঘব করা সম্ভব। বয়স্করাই কিন্তু বেশিরভাগ 'অস্টিও-আর্থ্রাইটিস'-এর সমস্যায় ভোগেন। এই সমস্যায় হাঁটাচলা করতে খুবই অসুবিধা হয়। সমস্যা বাড়লে ধীরে ধীরে হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে গিয়ে হুইলচেয়ারের সাহায্য নিতে হয়। এই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে যখন অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায় তখন 'নি-রিপ্লেসমেন্ট' করার প্রয়োজন পড়ে।

উপসর্গ : ব্যথা এবং প্রদাহ হালকা থেকে মাঝারি হতে পারে। তবে চিকিৎসা না করলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটা খারাপের দিকে গড়ায়। পেশির দুর্বলতাও দেখা যায়। জয়েন্ট ফুলে যেতে পরে এবং গরম হয়ে থাকে। দীর্ঘক্ষণ বিশ্রামে থাকলে জয়েন্টগুলো শক্ত হয়ে এবং তখন নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়। বিশেষ করে চড়াই বা ওপরে হাঁটার সময় ব্যথা বেশি হয়। হাঁটু বাঁকানোর সময় একটি কড়-কড় শব্দ হতে পারে অস্থিসন্ধিতে। পা ধনুকের মতো বেঁকে যায়। জয়েন্টের চারপাশে হাড়বৃদ্ধি পায়। আক্রান্ত স্থানে ব্যথাযুক্ত ফোড়া বা ফোস্কা হতে পারে।

রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস : রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা (আরএ) এক দীর্ঘমেয়াদি রোগ, যা প্রাথমিক ভাবে অস্থিসন্ধিকে প্রভাবিত করে। আপাতভাবে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে শুধু জ্বরভাব থাকে। অতিরিক্ত ক্লান্তি ও দুর্বলতাও এই রোগের লক্ষণ। চোখ ফুলে লাল হয়ে যায়। এছাড়া অনবরত জল পড়া, চোখে জ্বালা, চুলকানি হলেও সতর্ক হতে হবে কারণ চোখের সংক্রমণ ভেবে অনেকে বুঝতে পারেন না এড়িয়ে যান। এতে অন্ধত্ব আসতে পারে।

রোদে সেঁকে সুস্থ : শরীরে ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলেই আর্থ্রাইটিস হবার সম্ভাবনা বাড়ে। যে খাবার থেকে ভিটামিন ডি পাওয়া যেতে পারে, সেসব খাবার খাওয়ার চল আমাদের দেশে কম। কয়েক রকম বাদাম, সবজি থেকে যতটুকু ভিটামিন ডি পাওয়া যায়, তা শরীরের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই ভিটামিন ডি-র সবচেয়ে ভালো উৎস হলো সূর্যের আলো। রোদে কিছুক্ষণ শরীর সেঁকলে সেই প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। তবে ভরদুপুরের চড়া রোদে নয়। দিনের কিছুটা সময় সূর্যের আলো গায়ে লাগান। নিয়মিত শরীরচর্চা করা প্রয়োজন। খুব বাড়াবাড়ি হলে অস্ত্রোপচারই পথ। তবে বেশি বয়সে অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না।

সেক্ষেত্রে স্টেরয়েডবিহীন যন্ত্রণানাশক ওষুধ, স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন, ফিজিওথেরাপি, গরম বা ঠাণ্ডা সেঁক— এগুলোই পথ। তবে কোনো কিছুই কাজে না এলে হাঁটু প্রতিস্থাপনের দিকে এগোতে হবে। এই মুহূর্তে নি-রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি যেকোনো ধরনের আর্থ্রাইটিসের জন্য সফল চিকিৎসা অনেকেই এটা করে সুস্থ জীবন ফিরে পেয়েছেন। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়। □

জাতীয় একাত্মতা ও মোক্ষলাভের মাঘমেলা

দুর্গাপদ ঘোষ

ত্রিবেণী সঙ্গম, প্রয়াগরাজ ঃ প্রয়াগরাজ ত্রিবেণী সঙ্গমে এ বছরের মাঘমেলা শুরু হয়েছে গত ৩ জানুয়ারি পৌষ পূর্ণিমার দিন থেকে। ১৫ ফেব্রুয়ারি মহাশিবরাত্রির দিন পর্যন্ত ৪৪ দিন ধরে চলবে এই পরম্পরাগত সনাতনী মানবমেলা ও পুণ্যস্নান। এদিন থেকে শুরু হয়েছে প্রায় ৪ লক্ষ পুণ্যার্থীর কল্পবাসও। টানা একমাস ধরে চলবে এই কৃচ্ছসাধন। একবেলা করে আতপ চালের ভাত, একটু গাওয়া ঘি, একটু আলুসেদ্ধ ইত্যাদি আহার, মাটিতে বালিশ ছাড়া শয়ন, নিত্যদিন প্রাতঃকালে সঙ্গমে অথবা গঙ্গায় স্নান করা। মাটির উনুনে গোবরের ঘুটের জ্বালে রান্না এবং নিজের ইষ্টদেবের সঙ্গে সূর্যস্তব ইত্যাদি। মাটির উনুন এবং ঘুঁটে বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে নেমেছে গঙ্গার তীরবর্তী ২৭টি গ্রামের প্রায় ১৫ হাজার মহিলা। মেলায় ঘুঁটে বিক্রি করতে আসা আরতি নামের একজন জানালেন যে তিনি এবং তাঁর পরিবারই ৭ হাজার উনুন তৈরি করে বিক্রয় করছেন। এইভাবে ভোজনরন্ধনই কল্পবাসীদের পরম্পরা।

কুম্ভমেলায় শাহীস্নানের মতো মাঘমেলাতেও বিশেষ বিশেষ তিথি বা নক্ষত্রযোগে বিশেষ স্নান হয়ে থাকে। এবারে সেই বিশেষ ৬ দিন হলো, ৩ জানুয়ারি পৌষপূর্ণিমা, ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি, ১৮ জানুয়ারি মৌনী অমাবস্যা, ২৩ জানুয়ারি বসন্তপঞ্চমী, ১ ফেব্রুয়ারি মাঘীপূর্ণিমা এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি মহাশিবরাত্রির দিন। বছরে বছরে তারিখ এদিক-ওদিক হলেও প্রতি বছরই এই ত্রিবেণী সঙ্গমে মাঘমেলা এবং উল্লেখিত তিথিগুলিতে বিশেষ পুণ্যস্নান হয়ে থাকে। তবে এবারের বৈশিষ্ট্য হলো ১৪৪ বছর পরে একই মহাজাগতিক যোগে তা হচ্ছে। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর আগমন-নির্গমন যেমন হচ্ছে তেমনি এই মেলার আয়োজক তথা উত্তরপ্রদেশ সরকার ও প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থাও ব্যাপক। গতবছর মহাকুম্ভ মেলাকে কেন্দ্র করে যে বিশেষ 'সঙ্গম পুলিশ থানা' তৈরি করা হয়েছিল তা এখনও বহাল রয়েছে। সেখানেই দেখা পাওয়া গেল এবারের মেলা অধিকারী ঋষি রাজা-র সঙ্গে। বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে জানালেন যে এবারের মাঘমেলাকে তাঁরা অন্যান্য বারের মাঘমেলার মতো মনে করছেন না। কর্তৃপক্ষের অনুমান, এবার সবদিন মিলিয়ে ১২ থেকে ১৫ কোটি পুণ্যার্থীর আগমন হতে পারে। প্রথম দিন থেকেই তার লক্ষণ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সাধারণভাবে কোনও অর্ধকুম্ভেও এত পুর্ণার্থী সমাগম হয় না।

৩ জানুয়ারি কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যেও ২৩ লক্ষ পুণ্যার্থীর আগমন ও স্নান হয়েছে। সেই হিসাবে ২০২৬ সালের এই মাঘমেলাকে 'দ্বিতীয় কুম্ভ' হিসাবে দেখছেন তাঁরা। সেইমতো যথাযথ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। সড়ক, রেল ও বিমান, তিন দিক দিয়ে আসা পুণ্যার্থীদের জন্য পৃথক-পৃথক মার্গের

ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু সড়কপথে আগতদের মধ্যেও পদযাত্রী, বাস, ট্রাক, অটো, টোটো এবং ব্যক্তিগত গাড়িতে আগতদের জন্য তিনটি পৃথক প্রবেশ ও প্রস্থান পথ নির্ধারিত হয়েছে। তৈরি রাখা হয়েছে মোট ৪৩টি পার্কিং লট। যেখানে প্রায় ২ লক্ষ যানবাহন অবস্থান করতে পারবে। উত্তরপ্রদেশ সরকার ৩ হাজার ৮০০টি বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করেছে। আর কেবল মেলা চত্বরে চলাচলের জন্য রাখা হয়েছে বিদ্যুৎচালিত দূষণহীন ৫০টি বাস। যানবাহন চলাচল এবং পদযাত্রীদের যাতায়াত সুচারুভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে ৪০০ জন ট্রাফিক পুলিশ। ঝুসির দিক থেকে মেলা চত্বরে যাতায়াতের জন্য ১৮টি ভাসমান পন্টুন ব্রিজ বানানো হয়েছে যা আদ্যোপান্ত গেরুয়া রঙে রঞ্জিত। পুণ্যস্নানার্থীদের পথ প্রদর্শনের জন্য আছেন ১০ হাজার পুলিশ ছাড়াও প্রায় ২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য এবারই প্রথম ৩০ জন মহিলা কমান্ডো মোতায়েন করা হয়েছে। তাছাড়া নজরদারির জন্য লাগানো হয়েছে ১ হাজার ৬০০ সিসিটিভি ক্যামেরা। মাঘমেলার পুলিশ প্রধান নীরাজ পাণ্ডে জানালেন যে বিশেষ স্নানের ৬ দিন পুরো মেলাক্ষেত্রকে 'নো ভিহিকল্ জোন' রাখা হবে। ওইসব দিনে মেলা চত্বরে কোনও যানবাহন প্রবেশ করতে পারবে না। মাঘমেলা যাতে যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য ৪ হাজার ৯০০টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য পুরো মেলাক্ষেত্রের ৮০০ হেক্টর এলাকাকে ৭টি সেক্টরে ভাগ করেছেন মেলার আয়োজকরা। সঙ্গম এলাকাকে রাখা হয়েছে ১ নম্বর সেক্টরে। আয়তনের দিক থেকে এই সেক্টর সবচাইতে ছোট হলেও সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই সেক্টরেই জগদগুরু শঙ্করাচার্যরা ছাড়াও প্রমুখ সন্ত মহারাজদের ছাউনি বা আখড়া স্থাপিত হয়েছে। অক্ষয়বট মার্গ, খাদানজা মার্গ এবং সঙ্গম আপার মার্গ তথা 'লেটে হনুমান' মন্দির সংলগ্ন এলাকায় শতাধিক সেবামূলক সংস্থা ভাণ্ডারা খুলেছে। সেখানে প্রতিদিন দুপুরে পুণ্যার্থীদের বিনামূল্যে ভরপেট ভোজন করানো হচ্ছে।

কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিধিব্যবস্থার কথা জানার পর মেলা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়া গেল। প্রতিবার কুম্ভমেলার মতো সাধুসন্তরা মাঘমেলাতেও আসেন। এবারও এসেছেন, আখড়ায় আখড়ায় ধুনি জ্বলছে, চলছে ভজন, পূজন, সাধন ও আরাধনা। মহিলা নাগা সন্ন্যাসিনীদের 'কিন্নর আখড়া'র ছাউনিও রয়েছে। ছাউনি ও তাঁবুতে তাঁবুতে ভরে গেছে গঙ্গার ওপরে শাস্ত্রী ব্রিজের তলা এবং দুপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা। যতদূর চোখ যায় যেন লালচে-হলুদ পলাশের বন। গগণচুম্বি কোনও কোনও গৈরিক পতাকার মাঝখানে ভগবান রামচন্দ্রের চিত্র অঙ্কিত। হাওয়ায় আন্দোলিত পতাকা এবং গৈরিক বসনধারী অসংখ্য সাধুসন্তের চলাচলে মনে হচ্ছে যেন গেরুয়ার প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে নানা বৈচিত্র্যের সাধুসন্তের দর্শনলাভ। কোনও টবে ধান কিংবা গমের বীজ বুনলে যেমন ঘন পাতায় লকলকিয়ে ওঠে তেমনি মাথার উপরে জটাজুটে টবের আকৃতির উপর গজিয়ে ওঠা গমের গাছ এবং হাতে দীর্ঘ ত্রিশূলধারী একজন সাধুর গমনপথের দিকে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, মাঘমেলায় কি কেবল 'ডুবকি' দেবার জন্য এসেছেন! বললেন, 'পৌধ' (উদ্ভিদ) গজানো মাথা নিয়ে তো ডুব দিতে পারবেন না, তবে কপাল পর্যন্ত ডুবিয়ে নেবেন। এই অদ্ভুত কিন্তু অতি সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীর কথায়, পুণ্য তো গঙ্গার যে কোনও জায়গায় স্নান করলেই হয়। কিন্তু তাঁর আসা লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্যে এসে তাদের সঙ্গে মেলার জন্য, মেশার জন্য, একাত্ম হবার জন্য। মাটি ছাড়া মাথার উপরে এরকম গাছ গজালো কী করে? মুচকি হেসে ত্রিশূল বাগিয়ে চলে যেতে যেতে বলে গেলেন, 'হোতা হ্যায়, হোতা হ্যায়। হর রোজ গঙ্গা মাইয়া কী পানি দেতা হুঁ।' কুম্ভমেলার মতো এবারের মাঘমেলাতেও এরকম অনেক চলমান শিবের দর্শন মিলেছে।

গত বছর মহাকুম্ভে দক্ষিণ ভারতের অনেক পুণ্যর্থীকে দেখেছিলাম। কিন্তু ভারতের উত্তর-দক্ষিণ সমন্বয়ের, একাত্মতার লক্ষ্যে কাজ করছে এরকম কোনো সংগঠনকে দেখিনি। এবার মাঘমেলায় তা দেখলাম। সঙ্গমের পিন পয়েন্টে যাবার জন্য নৌকার সন্ধানে যমুনার ঘাটের দিকে যাচ্ছি, নজরে পড়ল তামিলনাড়ু থেকে আগত শতাধিক লোক সামান্য দূরে গেরুয়ায় মোড়া একটা মণ্ডপের দিকে যাচ্ছেন। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁরাও কি পুণ্যস্নান করতে এসেছেন নাকি কেবল দর্শন করতে?

জানালেন, পুণ্যস্নান তো বটেই। কিন্তু তাঁরা এসেছে উত্তর ভারতের মানুষদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মানুষদের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে। এজন্য 'কাশী-তামিল সঙ্গমম্' নামে যে সংগঠন তৈরি হয়েছে এঁরা সেই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। পাশের মণ্ডপের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি ভেতরে প্রচুর মানুষ সাগ্রহে অনুষ্ঠান দেখছেন। বাইরে বড়ো বড়ো করে লেখা— 'কাশী-তামিল সঙ্গমম্'। তার সঙ্গে আরও লেখা রয়েছে 'তামিল করকলম্'। অর্থাৎ নিজের হাতে (কর) কালিকলমে তামিল অক্ষর লেখুন অর্থাৎ তামিল ভাষা শিখুন। ভিতরে গিয়ে দেখলাম তামিল লোক সংস্কৃতির নানারকম কলাকৌশল প্রদর্শিত হচ্ছে। পাশের একটা প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকছেন উত্তর ভারতের একজন সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষ। উত্তর-দক্ষিণ যেন একাকার হয়ে গেল, একাত্ম হয়ে গেল। একটু পরে দুই অনুষ্ঠানের মাঝের অবসরে একজন মাইকে বিষ্ণুপুরাণ থেকে উদ্ধৃত করলেন, 'উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণং। বর্ষং তৎ ভারতম্ নাম ভারতী যত্র সন্ততি'।। হিন্দি ও তামিল উভয় ভাষাতেই ব্যাখ্যা করা হলো, 'উত্তর হিমালয় থেকে দক্ষিণে হিন্দু মহাসাগর পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড নিয়েই আমাদের এই দেশ সনাতন ভারতবর্ষ। উত্তর-দক্ষিণ আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডের দুই অংশের মতো। তার যে কোনও অংশে আঘাত পড়লে সমগ্র দেহে প্রতিক্রিয়া হবে।' কথাগুলো শুনে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল, এঁদের তামিলনাড়ুতে উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি মারান 'সনাতন উন্মূলন সমাবেশ' করেন কোন সাহসে! এটা একটা সনাতনী পুণ্য মেলা। একটু রাজনীতি ঘেঁষা হয়ে গেলেও প্রশ্নটা করেই ফেললাম। উত্তরে অনাবিল হাসি ছড়িয়ে একজন কর্মকর্তা বললেন, 'Let us see this time what would happen'— দেখা যাক এবার কী হয়!

আশার বার্তা শুনে এগিয়ে গিয়ে নৌকায় চড়লাম। গত বছর মহাকুম্ভে সনাতনী হিন্দুত্বের পুণর্জাগরণের যে বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল এক বছরের মধ্যে তার ব্যাপ্তি যে সুদূর দক্ষিণের গ্রাম-গ্রামান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এটাই তো সনাতনীদের সত্যিকারের একটা রূপ। মাঘমেলার আয়োজকদের প্রাক্ অনুমান যদি বাস্তবে রূপ নেয় তাহলে সেই ১২ থেকে ১৫ কোটির প্রভাব ১০০ কোটির মধ্যে বিস্তৃত হতে খুব বেশি সময় লাগবে বলে মনে হয় না। এই মাঘমেলাতেও সর্বত্যাগী ধর্মাচার্যরা সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং 'হিন্দুরাষ্ট্র' গঠনের যে আহ্বান জানাচ্ছেন তা বাস্তবে রূপায়িত হলে তবেই তো হিন্দুদের এতদিন ঘুমিয়ে থাকার, নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকার পাপস্খলন হবে। অর্জিত হবে অধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণার পুণ্য।

ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করলে হয় পুণ্যার্জন আর অক্ষয়বট দর্শন করলে হয় মনের তৃপ্তি, আত্মার শান্তি। অমৃত কুম্ভের থেকে ছিটকে পড়া কয়েক ফোটা অমৃতের এই স্পর্শভূমিতে এসে ডুব দিলে লাভ হয় অমরত্ব, নির্বাণ, মোক্ষ। আর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি-বিজড়িত এই পবিত্র বৃক্ষ দর্শনে লাভ হয় স্থায়িত্ব, অক্ষয়ত্ব।

মৌনী অমাবস্যার মহাযোগে বিশেষ পুণ্যস্নান ছাড়াও মাঘমেলায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্নানের দিন বা তিথি হলো মকর সংক্রান্তি। পৃথিবী গ্রহের সৃষ্টিকর্তা সূর্যদেবের উত্তরায়ণ সূত্রে উত্তর গোলার্ধে এদিন থেকে শুরু হয় দিনের সময় বৃদ্ধি পাওয়া। বেশিক্ষণ অন্ধকারের থেকে বেশিক্ষণ আলোর দিকে যাত্রা করা—তমসো মা জ্যোতির্গময়। এদিন সূর্য মকররাশিতে প্রবেশ করে মানব জীবনকে আরও বেশি আলোকিত করতে শুরু করে। সনাতন সংস্কৃতির মূল কথা হলো মানব সভ্যতার আলো

বেশিমাত্রায় পৌঁছে দেওয়া। এজন্য সনাতনী হিন্দুরা সুদীর্ঘ কাল থেকে এই শুভ ও পবিত্র দিনকে পরম শ্রদ্ধায় বরণ ও পালন করে আসছেন। পুণ্যস্নানের মাধ্যমে জীবনকে আরও পরিশুদ্ধ করে নিচ্ছেন। মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাস বলছে যে একসময় দিনটি পালিত হতো ইংরাজি বর্ষপঞ্জির ২১ ডিসেম্বর। এটাই ছিল আসলে 'বড়দিন'-এর শুরু। কিন্তু সূর্যকে পরিক্রমণ করার কক্ষপথে পৃথিবীর চলার গতি কিছুটা মন্থর হওয়ার কারণে এখন দিনটি পরিবর্তিত হয়ে ১৪-১৫ জানুয়ারি হয়ে গেছে। সুদূর ভবিষ্যতে তিথিটা হয়তো আরও পিছিয়ে যেতে পারে। হিন্দুধর্ম এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাজ্ঞ ডঃ অমিতাভ গৌর পরিচয়ে একজন ধর্মাচার্যের প্রবচনে ব্যাখ্যাটা গভীর মনোযোগে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছিলাম। ভাবছিলাম বিজ্ঞান ও ইতিহাসের কী অদ্ভুত সমন্বয়। কেবল ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের বহু দেশে সূর্যের উত্তরায়ণ বা মকর সংক্রমণকে কেন্দ্র করে আনন্দ উৎসব পালিত হয়ে আসছে। কারণ, সূর্যের এই অয়ন শুরুর সঙ্গে এদিন থেকে শুরু হয় শীতলতার সংকট থেকে মুক্তি লাভ করা। অধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে এই মুক্তিকে এক ধরনের পরিত্রাণ লাভ বলা যেতে পারে, 'মোক্ষ' লাভ বলা যেতে পারে। ভাষার বৈচিত্র্যে দেশে দেশে একে বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন অভিধায় উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। জাপানের প্রাচীন পরম্পরাগত উৎসব 'তোজি', চীনের 'দাংজি', উত্তর আমেরিকার রেডইন্ডিয়ানদের 'সয়াল', মঙ্গোলীয়দের 'সাগানসার', সাইবেরিয়ানদের 'খালোলো', ফিনল্যান্ডের 'কেওরি', উত্তর ইউরোপীয়দের 'ইউল', রাশিয়ানদের 'কোলেয়াদ' প্রভৃতি উৎসবের মূল তত্ত্ব একই—সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু। দেশে দেশে এইসব উৎসবের দিন তারিখও হয়তো কিছুটা এদিক-ওদিক। কিন্তু উৎসবের মূল কেন্দ্র হলো সূর্য। রোমের প্রাচীন অধিবাসী প্যাগানদের 'স্যাটর্নোলিয়া' উৎসব এখনও হয়ে থাকে। একই রকমভাবে পারস্য (বর্তমানে ইরান) দেশের অগ্নি উপাসকরা এখনও তাঁদের 'মিথরা' (সূর্যদেবতার পূজার্চনার উৎসব 'সাব-এ-ইয়ালদা' পালন করে থাকেন। এই সমস্ত উৎসবেরই তত্ত্বগত দিক হলো, সূর্যের পুনরাগমনে শীতলতার কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া, মুক্তিলাভ করা। সনাতনী অধ্যাত্মিকতায় মোক্ষলাভ করা। উল্লেখিত উৎসবগুলির পালনকারীরা সকলেই সনাতনী হিন্দুদের 'মকর সংক্রমণ' উৎসবের মতো পবিত্র ও পরম্পরাগত উৎসব হিসাবে উদ্‌যাপন করে থাকেন। সনাতনী পরম্পরায় এদিন পুণ্যস্নান করলে কেবল জাগতিক নয়, তমসাচ্ছন্ন মানসিকতার পাপস্খলন ঘটে এবং জ্যোতির্ময়ী মানসিকতার জন্য পুণ্যার্জন লাভ করা যায়।

কুম্ভমেলার মতো মাঘমেলাতেও সঙ্গমে স্নান করার পর অর্জিত পুণ্যকে অক্ষয় করে রাখার জন্য ভক্তরা অনেকেই সঙ্গম থেকে দেড় কিলোমিটার মতো দূরে অক্ষয়বট দর্শন করে থাকেন। পরম পবিত্র এই বটগাছটি রয়েছে মোগল শাসক আকবরের সময়ে তৈরি করা দুর্গের মধ্যে। এই দুর্গের মধ্যে আছে পাতালপুরী মন্দির এবং সরস্বতী কূপও। গত বছর মহাকুম্ভের সময় পুণ্যার্থীরা যাতে অক্ষয়বট সহজে দর্শন করতে পারেন সেজন্য দুর্গের বাইরে থেকে সেখানে পৌঁছনর জন্য উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার প্রশস্ত করিডোর তৈরি করেছে। দর্শনার্থীদের সঙ্গে প্রায় ঠেলাঠেলি করতে করতে সেখানে পৌঁছে দেখি সম্পূর্ণ হলুদ বসন পরা একজন সন্ন্যাসী খুব জোরে জোরে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলে চলেছেন, 'ক্যা দেখ্ রহে হোলো, বরগদ (বটগাছ)। নহী...নহী ইয়ে এক পেড় (গাছ) নহী, সনাতন হ্যায়, সনাতন। জো কভী মরতা নহী। জিসকো খতম নহী কি যা সকতি হ্যায়।' অবাক বিস্ময়ে একবার অক্ষয়বট একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, কী গুরুত্বপূর্ণ কথাই না বলছেন। এমন সময় একদল ভক্ত এল যাদের মধ্যে বেশিরভাগই যুব বয়সি, সমস্বরে বলে উঠলেন—জয় শ্রীরাম। অনুভব করতে দেরি হলো না, সনাতন সত্যিই চিরস্থায়ী, অমর, অক্ষয়। সামনের এই 'অক্ষয়বট'-এর মতো। যাকে মেরে কেটে জ্বালিয়ে পুড়িয়েও শেষ করার শক্তি কারও নেই। ঠিক কতদিন ধরে এই বৃক্ষ অক্ষয় হয়ে আছে কেউ জানে না। কমপক্ষে ৭ হাজার বছর তো বটেই। রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে বনবাস গমনে বেরিয়ে ভগবান রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী এই বটবৃক্ষের নীচে ৩ দিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন। শ্রীরামের স্মৃতিবিজড়িত বলেও বৃক্ষটি হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র। এখানে এসে ভক্তরা শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনি দেবেন এ আর নতুন কথা কী ? ইতিহাস বলছে, সঙ্গমে আগত পুণ্যার্থীদের দলে দলে এসে এই বটবৃক্ষের দর্শন করা দেখে সহ্য না করতে পেরে চতুর্থ মোগল শাসক জাহাঙ্গীর সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এর মূলে কুঠারাঘাত করেই ক্ষান্ত হয়নি। আর কোনওদিন যাতে জেগে উঠতে না পারে সেজন্য আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতেও দেরি করেনি। কোনও কোনও তথ্য মোতাবেক সিসা গলিয়ে ঢেলে দিতেও বাকি রাখেনি। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ক্ষয় হতে হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু অস্তিত্ব বহাল রয়েছে সেই বটবৃক্ষের। অসহিষ্ণু, অত্যাচারীদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অক্ষয় হয়ে আছে 'অক্ষয়বট'। কবে এর আবির্ভাব হয়েছিল, কেমনভাবে হয়েছিল তা যেমন কেউ জানে না, তেমনি কতদিন এইভাবে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাও কেউ জানে না। দীর্ঘ জটাধারী এই সন্ন্যাসীর অভিধায় এই বৃক্ষ তাই 'সনাতন'— 'ন ভুতো ন ভবিষ্যতি'। ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করলে হয় পুণ্যার্জন আর অক্ষয়বট দর্শন করলে হয় মনের তৃপ্তি, আত্মার শান্তি। অমৃত কুম্ভের থেকে ছিটকে পড়া কয়েক ফোটা অমৃতের এই স্পর্শভূমিতে এসে ডুব দিলে লাভ হয় অমরত্ব, নির্বাণ, মোক্ষ। আর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি-বিজড়িত এই পবিত্র বৃক্ষ দর্শনে লাভ হয় স্থায়িত্ব, অক্ষয়ত্ব।

এবারের মাঘমেলা অন্যতম বিশেষত্ব বলা যেতে পারে কল্পবাসীদের এলাকা। এর আগে এতজন কল্পবাসী কখনও এখানে অবস্থান করেননি। ৯৫০ বিঘা জমি জুড়ে তাঁদের তাঁবু পড়েছে। আয়োজকদের পক্ষে তাই এই এলাকার পৃথক নামকরণ করা হয়েছে 'প্রয়াগওয়াল নগর'। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যাঁরা কল্পবাস করছেন তাঁদের বেশিরভাগেরই বয়স ৭০ বছরের বেশি। জৌনপুর থেকে আগত ৮৫ বছর বয়সি বিদ্যাদেবীর মতো পুণার্থীও আছেন। পরপর ১২ বছর তিনি ত্রিবেণী সঙ্গমে এসে কল্পবাস করছেন। তাঁর কথায়, দ্বাদশ বার এটা করলে মা গঙ্গার কোলে চিরকালের জন্য আশ্রয় পাওয়া যায়। লাভ করা যায় মোক্ষ। এই বয়সে, এইরকম ঠাণ্ডার মধ্যেও প্রতিদিন ভোর ৪ টের সময় উঠে গঙ্গাস্নান করে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা তুলসীগাছের সামনে বসে পূজার্চনা করেন। দুপুরে ঘুঁটের জ্বালে মাটির উনুনে নিজের হাতে মাটির হাঁড়িতে মা গঙ্গার জন্য ভোগ রান্না করে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিনা বালিশে, মেঝের ওপরে খড় পেতে শয়ন করেন। প্রতি সন্ধ্যায় কোনও না কোনও ধর্মাচার্যের আখড়ায় গিয়ে প্রবচন শোনেন। কষ্ট হয় না ? উত্তরে মন ভোলানো ফোকলা হাসি ছড়িয়ে বললেন, কীসের কষ্ট। গাঙ্গংবারি মনোহারি মুরারি চরণচ্যুতং। স্বয়ং ভগবানের চরণচ্যুত মনোহর গঙ্গার জল সব কষ্ট দূর করে দেয়। সূর্যস্তবে সব ক্লান্তি, সব ক্লেদ দূর হয়ে যায়। এহেন দেবীদের প্রণাম না করে ফিরতে পারলাম না। ■

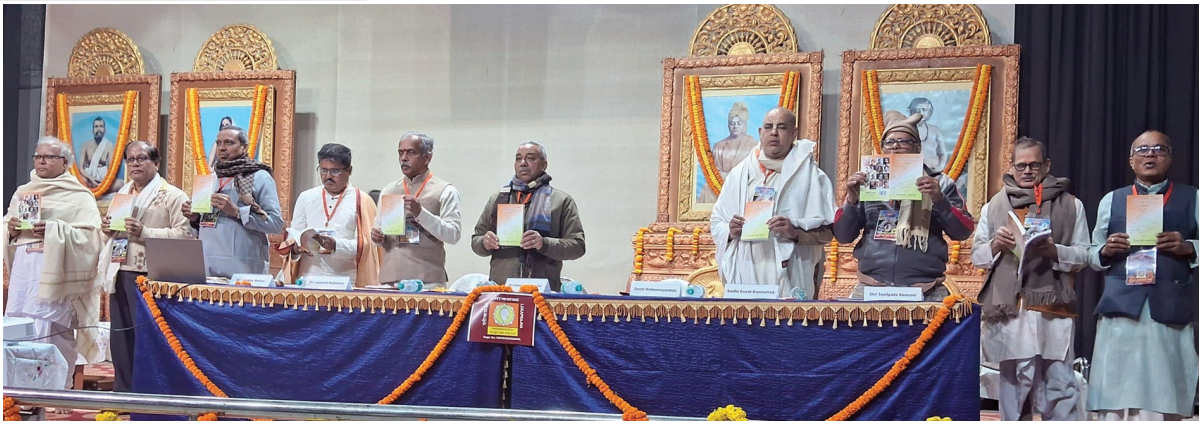

সারগাছিতে লোকপ্রজ্ঞার অনুভব দর্শন অনুষ্ঠান

গত ২৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে এবং বেলডাঙ্গার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে লোকপ্রজ্ঞার ২৪তম অনুভব দর্শনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণ করেন ৫১০ জন প্রতিনিধি। গুরুকৃপা লাভ ও গুরুসেবার জন্য শ্রীগুরুজী যেখানে অবস্থান করতেন সেই পবিত্র কক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধরজী এবং সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বময়ানন্দ মহারাজের পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর আশ্রমের সন্ন্যাসীও ব্রহ্মচারীদের কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের আগে ও পরে দুই অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে পথনির্দেশ করেন রামদত্তজী, নন্দকুমারজী, শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব মহারাজ এবং সুনীলপদ গোস্বামী। অনুষ্ঠানে চারটি পুস্তক প্রকাশ কর হয়। সেদিনই সন্ধ্যায় সকলেই বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে চলে আসেন। রাত্রি ৮টা থেকে ৯টার অধিবেশনে নন্দকুমারজী বক্তব্য রাখেন। পরদিন দুপুরে জগদ্বন্ধু ধাম ডাহাপাড়া আশ্রমে বক্তব্য রাখেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ বক্তব্য রাখেন। পরদিন বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ এবং ডাহাপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ নরহরি ব্রহ্মচারী মহারাজের বক্তেব্যের পর সমাপ্তি পথনির্দেশের পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হাতিয়াড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে হিন্দু সম্মেলন

গত ১ জানুয়ারি কলকাতার বাগুইআটির উপকণ্ঠে হাতিয়াড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে এক হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকে শতশত মানুষের আগমন ঘটে। মন্দির ও আশেপাশের প্রাঙ্গণে দেখা যায় ধর্মীয় আবহ, ভক্তিও উৎসবের আবেগ। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শিশুমন্দিরের প্রধানাচার্য শ্রীমতী সুপর্ণা ঘটক, মতুয়া সম্প্রদায়ের অরবিন্দ বাড়ুই, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়, প্রান্ত ব্যবস্থা প্রমুখ সীতারাম দাগা, কলকাতা মহানগর প্রচারক নরেন্দ্রনাথ বেরা, পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল প্রমুখ। সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন। এই সম্মেলনে লেখক রতন গুড়িয়ার একটি গবেষণাধর্মী ও তথ্যমূলর পুস্তক উন্মোচন করা হয়। শ্রীগুড়িয়া পুস্তকটি তুলে দেন প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়ের হাতে। শ্রীরায় লেখককে শুভকামনা জানান।

নিউইয়র্কে অনুপ দাস ড্যান্স অ্যাকাডেমি (আড্ডা)-র উদ্যোগে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৭ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংস্থা অনুপ দাস ড্যান্স অ্যাকাডেমি (আড্ডা)-র উদ্যোগে বাংলাদেশের বিজয় দিবস পালন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙ্গালি জাতীয়তার গৌরবময় অধ্যায় এবং স্বাধীনতার চেতনাকে স্মরণ করানোর জন্য এবারের থিম ছিল— 'দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা।' বীর মুক্তিযোদ্ধা খুরশিদ আলম বাবলুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গেয়ে কেক কেটে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। 'মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ' বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বেশ কয়েকজন কিশোর-কিশোরী। এদের উপস্থাপনা খুবই আশাব্যঞ্জক। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা নিয়ে নতুন প্রজন্মের ভাবনা উপস্থিত সকলের মন ছুঁয়ে যায়। এতে অংশগ্রহণ করে অনিন্দ্য সেন ভৌমিক, জয়িতা অরোরা, শৌভিত রায়চৌধুরী। এরপরে চন্দন চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় গানের পর্ব। এতে অংশগ্রহণ করে আড্ডার খুদে শিল্পী— অর্জুন, শৌভিক, আরাধ্যা ও অভিয়াংশু। 'সূর্যাদয়ে তুমি, সূর্যাস্তে তুমি, ও আমার বাংলাদেশ,

পূর্বদিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্তলাল, আমরা বাংলায় গান গাই। দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা।' এই পর্বটি সকলকে কিছু সময়ের জন্য ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে ফিরে নিয়ে যায়। এরপর নাচের পর্ব। শিল্পীরা 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' গানের সঙ্গে নেচে নেচে শ্রদ্ধা জানায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণবলিদানকারী ৩০ লক্ষ বীরযোদ্ধাকে। সৃজিতা হিয়ার নেতৃত্বে এতে অংশ নেয় অদিত্রী রয়, আদ্রিকা সেন ভৌমিক, অসমিতা দাস, সংযুক্তা দেবনাথ। অতিথি শিল্পীদের পরিবেশনায় ছিল মুক্তির গান। এতে অংশগ্রহণ করেন প্রিয়াঙ্কা দাস, শৌভিত রায়চৌধুরী, রুনা রায় ও রুমা চৌধুরী। বকিতা আবৃত্তি করেন ক্লারা রোজারিও, ড. ধনঞ্জয় সাহা, শ্যাম বৈদ্য, বনানী সিনহা। সকলের পরিবেশনায় ফুটে ওঠে দেশপ্রেম। অতিথি পর্বে অংশ নেন সাগর লোহানী, রওশন আরা নিপা, সুলেখা পাল, আশিস রয়, কল্লোল দাশ। আরও ছিলেন উদীচী, যুক্তরাষ্ট্র। স্বপ্ন সংগঠনের সহযোগীরা অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছেন। যন্ত্রসংগীতে ছিলেন স্বপন দত্ত। অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের জাতীয় পতাকা ও লাল গোলাপ দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিলেন সুমিত্র সেন, অয়াকুব আলী মিঠু, আলপনা গুহ। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন গণেশ ভৌমিক ও সুকুমার দেবনাথ, সুমিত্রা সেন ও ইয়াকুব আলী মিঠু।

কলকাতায় এবিআরএসএমের মহামিছিল ও সমাবেশ

গত ৪ জানুয়ারি অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের উদ্যোগে দলীয় রাজনীতি, দুর্নীতি, তোষণ ও বঞ্চনামুক্ত শিক্ষার দাবিতে কলকাতার রাজপথে মহামিছিল ও শিক্ষক সমাবেশের আয়োজন করে। জেলা ও রাজ্যস্তরের কয়েকশো শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর উপস্থিতিতে দুপুর ১২টায় মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে রানি রাসমণি রোজে শেষ হয়। সেখানে শিক্ষক সমাবেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের পাশাপাশি পার্শ্বশিক্ষক, ভোকেশনাল শিক্ষক, লাইব্রেরিয়ান, আইসিটি-সহ অন্যনান্য শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত অধিকারের দাবি উঠে আসে।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বাপি প্রামাণিক শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, রাজনীতি, তোষণ ও বঞ্চনার অজস্র উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি ডিএ বঞ্চনা, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ইত্যাদি ইস্যুতে রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি আশিস মণ্ডল বলেন ভারতের সর্ববৃহৎ শিক্ষক সংগঠন এবিআরএসএম শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশাগত দাবি আদায়ের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, রাজনীতি, তোষণ ও শিক্ষক নিগ্রহের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ ও কর্মসংস্থানের দাবিতে নিরন্তর লড়াই করে যাবে।

দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে শীতবস্ত্র প্রদান

গত ২ জানুয়ারি দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলার দলপুর জ্ঞানানন্দ সরস্বতী আশ্রমে একটি অনুষ্ঠানে জনজাতি সমাজের মানুষদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণ করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। উপস্থিত ছিলেন আশ্রমের মহারাজ শ্রীমাধবানন্দ সরস্বতী, সমাজসেবী অমিত দাস, দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সদস্য অসীমলাল মুখার্জি, স্থানীয় বাসিন্দা সৈকত গাঙ্গুলি, দেব ঘোষাল এবং নিরঞ্জন ঘোষাল। মোট ৪২ জন মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

‘বন্দে মাতরম্’-এর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে জাতীয় যুব সম্মেলন

‘বন্দে মাতরম্’-এর সার্ধশতবর্ষ (১৮৭৫-২০২৫) এবং সঙ্ঘজননেত্রী মা নমিতার জন্মশতবর্ষ (১৯২৬-২০২৫) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ২২ ডিসেম্বর ভারতের অধ্যাত্ম সমাজের উদ্যোগে মধ্য কলকাতা-স্থিত মহাজাতি সদনে আয়োজিত হয় ‘জাতীয় যুব সম্মেলন’। শুভময় সেনগুপ্তর কণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীতের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এই সম্মেলনের সম্মানীয় অতিথি ছিলেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক স্বামী বলভদ্রানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও অনুষ্ঠানমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এবং নৈহাটি বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ড. রতন কুমার নন্দী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন, কলকাতা-র অধ্যাপিকা ড. মধুমিতা দত্ত ও পথের আলো-র প্রাক্তন সম্পূজক কিঙ্কর সমীরণ মুখোপাধ্যায়। পরাধীন ভারতবর্ষে ‘বন্দে মাতরম্’ যে ছিল সমগ্র জাতির সঞ্জীবনী মন্ত্র, সেই বিষয়টি এদিন বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে। বক্তাদের বক্তব্য শেষে আয়োজিত হয় ‘উত্তিষ্ঠত’, ‘বন্দে জননীম্’ ও ‘দ্য স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড’ পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান। ২০২৫-এর ১৫ মে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন রুম্পা দাশ। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এভারেস্ট বিজয়িনীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এরপর এষা সেনগুপ্তর পরিচালনায় ‘গানভাসি বেলঘরিয়া’র পক্ষ থেকে পরিবেশিত হয় দেশাত্মমূলক গান। এই সংগীতানুষ্ঠানে ‘চারণগীতি’ পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পৌরোহিত্য করেন ‘ভারতের অধ্যাত্ম সমাজ’-এর সভাপতি ড. প্রবীর কুমার রায়।

সংস্কৃত সাহিত্যে অনুবাদ পরম্পরা বিষয়ক সম্মেলন

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ এবং সাহিত্য অ্যাকাডেমির উদ্যোগে গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো একদিবসীয় সংস্কৃত সাহিত্যে অনুবাদ পরম্পরা বিষয়ক সম্মেলন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্য এবং সাহিত্য অ্যাকাডেমির সংস্কৃত ভাষা বিষয়ক উপদেষ্টা হরেকৃষ্ণ শতপথী। বক্তা হিসেবে ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য ডঃ গোপা দত্ত, সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন অধ্যাপক অরুণরঞ্জন মিশ্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রফেসর মৌ দাস গুপ্তা, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ইন্দিরা চ্যাটার্জী, স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী কর, বর্তমান বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর চন্দন ভট্টাচার্য এবং বিভাগীয় প্রফেসর মৃণাল চন্দ্র দাস। সম্মেলনে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং অধ্যাপক মৃণাল চন্দ্র দাসের কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চরণের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভারম্ভ হয়।

সম্মেলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৩০জন প্রাবন্ধিক তাঁদের প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিভিন্ন বক্তাদের বক্তব্যে বারবার অনুবাদ পরম্পরা বিষয়ে বহু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় উঠে আসে, তার মধ্যে একটি হলো , এই অনুবাদের জন্য বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ভাষার জ্ঞান সকলের মধ্যে বিস্তৃত হয় এবং আমরা সকলে সেই সম্পর্কে অবগত হতে পারি। সম্মেলন সঞ্চালনা করেন বিভাগীয় অধ্যাপক ড. শুভ্রজিৎ সেন এবং অধ্যাপিকা ড. হুসনা পারভিন।

শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিভাগীয় অধ্যাপক অনিন্দ্য চৌধুরী।

দেবী সরস্বতী

স্বরূপ, বৈচিত্র্য, বিশ্ববিজয়

শ্রী প্রলয় নন্দী

দেবী সরস্বতী কলা ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সেজন্য বিদ্যাচর্চা বা শিল্পকলার অভ্যাসের প্রাক্কালে তাঁকে স্মরণ করা হয়। মহাভারতের সময় থেকেই এই পরম্পরার প্রচলন দেখা যায়। ভগবান ব্যাসদেব মহাভারত রচনার আগে লিখেছেন—

''নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।''

অর্থাৎ নারায়ণকে, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ নর ঋষিকে, দেবী সরস্বতীকে এবং ব্যাসকে নমস্কার করে জয় অর্থাৎ মহাভারত পাঠ করবে।

এই প্রথা বহুকাল যাবৎ প্রচলিত। পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যে গ্রন্থারম্ভে বা গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের আগে সরস্বতী-বন্দনার এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রধানত বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর আরাধনা করা হয়। বর্তমান সময়ে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা হয়। প্রাচীন যুগে দেখা যায় কৃষ্ণযজুর্বেদে নবমী তিথিতে সরস্বতীপূজার কথা বলা হয়েছে, শতপথব্রাহ্মণে পূর্ণিমা তিথিতে দেবী সরস্বতীর কাছে অঞ্জলি প্রদানের বিধান রয়েছে। তবে ব্রহ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পুরাণসমুচ্চয়, স্মৃতিসারোদ্ধার প্রভৃতি গ্রন্থে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতেই সরস্বতী আরাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তিথিটি শ্রী অর্থাৎ দেবী লক্ষ্মীর অত্যন্ত প্রিয়। সেই কারণে এটি শ্রীপঞ্চমী নামেও পরিচিত। আবার, প্রাচীন বর্ষগণনা অনুসারে এই দিন থেকে বসন্তকালের আরম্ভ হওয়ায় এটি বসন্তপঞ্চমী নামেও অভিহিত হয়।

'সরস্বতী' শব্দের নির্বচন : যাস্কমুনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ নিরুক্তে 'সরস্বতী' শব্দটিকে নদীপরক ও দেবীপরক— এই দুই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। দেবতাপরকে 'সরস্ শব্দের অর্থ জ্যোতিঃ। সেজন্যই সূর্যকে সরস্বান্ নামে অভিহিত করা হয়। দেবতাপরক অর্থে 'সরস্বতী' হলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। নদীপরকে 'সরস্' শব্দের অর্থ হলো জল। তার ফলে 'সরস্বতী' শব্দের অর্থ হয় প্রচুর জলসম্পন্ন নদী।

নদীরূপা সরস্বতী : বেদপুরাণাদি গ্রন্থে সরস্বতী নামক নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন গ্রন্থ পরিশীলনে জানা যায় যে, এই নদীর উৎপত্তি হিমালয় পর্বতের প্লক্ষপ্রস্রবণ থেকে। এই সরস্বতী নদী পুণ্যতীর্থ পৃথূদক অর্থাৎ পোহাবা কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশ হয়ে ক্রমশ পশ্চিম দিকে ঝুঁকে দ্বারকার কাছে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বর্তমানে সরস্বতী অন্তঃসলিলা। কিন্তু প্রাচীনকালে এর প্রবল জলধারা প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে মিলিত হতো বলে জানা যায়। কৃত্রিম উপগ্রহ দ্বারা এই প্রাচীন নদীর গতিপথের চিত্রও পাওয়া গিয়েছে। সরস্বতী এক সময় ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী ছিল। প্রচণ্ড প্রবাহের দ্বারা শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কারণে সরস্বতী নদী সুরক্ষিত দুর্গের সুদৃঢ় লৌহদ্বার-স্বরূপ ছিল। এই নদীর মহিমা বেদেও কীর্তিত হয়েছে।

অথর্ববেদে তিন প্রকার সরস্বতী নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়—

''দেবা অদুঃ সূর্যো দ্যৌরদাৎ পৃথিব্যদাৎ।
তিস্রঃ সরস্বতীরদুঃ সচিত্রা বিষদূষণম্।।
যদ্বো দেবা উপজীকা অসিঞ্চন্ধন্বন্যুদকম্।
তেন দেব প্রসূতেনেদং দূষয়তা বিষম্।।
অসুরাণাং দুহিতাসি সা দেবানামসি স্বসা।
দিবস্পৃথিব্যা : সম্ভূতা সা চকর্থারসং বিষম্।।'' (অথর্ববেদ ৬।১০০)

বেদে যে সকল নদীর কথা আছে, তাদের মধ্যে সরস্বতীকে শ্রেষ্ঠতম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঋষিদের মনে সবসময়ই নদীর সঙ্গে নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী জেগে উঠত। তাই, তাঁরা অধিকাংশ স্থলে সরস্বতী বলতে সরস্বতী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই বুঝিয়েছেন।

বাগ্দেবী সরস্বতী : শুক্লযজুর্বেদে (১৯।১২) একটি আখ্যায়িকা পাওয়া যায়— 'দেবা যজ্ঞমতন্বত ভেষজং ভিষজাশ্বিনা।। বাচা সরস্বতী ভিষগিন্দ্রায়েন্দ্রিয়াণি দধতঃ।।' অর্থাৎ, দেবতারা একটি যজ্ঞ করেন। সেখানে অশ্বিদ্বয় চিকিৎসক-রূপে এবং সরস্বতী 'বাচা' অর্থাৎ দেবতারা একটি যজ্ঞ করেন। সেখানে অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসক-রূপে এবং সরস্বতী 'বাচা' অর্থাৎ ত্রয়ীলক্ষণা বাগ্-এর সাহায্যে ইন্দ্রের বীর্য-সামর্থ্য সম্পাদন করেছিলেন। এখানেই প্রথম বাক্-এর (বাক্যের) সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু তিনি বাক্যদ্বারা ইন্দ্রের বলাধান করেছেন, তাই তাঁকে 'বাগ্দেবী' বলা যেতে পারে। এই বাক্ কে? ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১২৫-তম সূক্তের বাক্ সূক্তে দেবী স্বয়ং বলেছেন— আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি। আমি আদিত্য প্রভৃতি সকল দেবতাগণের সঙ্গে থাকি। আমি মিত্র ও বরুণকে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অবলম্বন করি। আমি রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। দেবতা ও মনুষ্যগণ যাঁর শরণাগত হয়, তাঁর বিষয়ে আমিই উপদেশ দিয়ে থাকি। যাকে মনে করি— তাকেই বলবান্, স্তোতা, ঋষি বা বুদ্ধিমান্ করতে পারি। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার অবস্থান ইত্যাদি।

বেদে পূষা, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়

এবং অন্যান্য দেবতাগণের সঙ্গে দেবী সরস্বতীরও বিচরণের কথা পাওয়া যায়। আবার বাক্ ও সরস্বতী উভয়েই জলে অবস্থান করেন এবং অন্যান্য গুণ উভয়েরই প্রায় সমান। এই ধরনের সাদৃশ্য থাকার কারণেই বোধ হয়, পরবর্তীকালে বাক্ ও সরস্বতীকে অভিন্ন জ্ঞান করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে 'সরস্বতী' শব্দের দ্বারা প্রধানত নদীকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের সময়ে সরস্বতী ও বাক্-কে অভিন্ন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, শতপথ ব্রাহ্মণে (৩.৯.১.৭) বলা হয়েছে— 'বাগ্বৈ সরস্বতী'। এই বাক্যে বাক্যমাত্রেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে বাক্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যে শক্তি বাক্যের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়, তিনিই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী। এই দেবীকে যিনি পেতে চান, তিনি বাক্যকেই সেই সরস্বতীরূপে উপাসনা করবেন— এটিই হলো পূর্বোদ্ধৃত মন্ত্রাংশের তাৎপর্য। বাক্য ও তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কার্যকারণরূপ সম্বন্ধবশত তত্ত্বগত দিক থেকে অভিন্ন; এই জন্য বাক্যেরই নামান্তর বাণী, ভারতী, সরস্বতী এবং বাক্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামও একই।

পদ্মাসীনা সরস্বতী : শাস্ত্রে বলা হয়েছে— 'সরস্বতী শ্বেতপদ্মাসনা'। আমাদের দেশে স্মরণাতীতকাল থেকে পদ্ম ফুল প্রায় সমস্ত দেবতার প্রিয়। শ্বেত ও নীল পদ্মের কথা ঋগ্বেদে বহুবার এসেছে, পুণ্ডরীক শ্বেতপদ্ম আর পুষ্কর নীলপদ্ম। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে পদ্মের আদর আরও বেড়ে যায়। ব্রাহ্মণগ্রন্থে পদ্মকে আমরা সর্বপ্রথম সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেখতে পাই। মহাভারতে দেখতে পাওয়া যায়, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ধ্যানরত বিষ্ণুর নাভি থেকে উৎপন্ন হন। পদ্মের উপর দেব বা দেবী বসে অথবা দাঁড়িয়ে থাকেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি-পদ্মে আসীন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং তাঁদের শক্তিত্রয় সরস্বতী, লক্ষ্মী ও পার্বতীর আসন— পদ্ম। অগ্নি, গণেশ, পবন— এঁরাও পদ্মাসীন। সূর্য, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এবং তাঁদের অবতারগণের পাদপীঠ— পদ্ম। সরস্বতী সাধারণত পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা বা আসীনা থাকেন। শিল্পশাস্ত্রও এইরূপ নির্দেশ করে থাকে। অংশুভেদ নামক আগম গ্রন্থে দেবীকে 'শ্বেতপদ্মাসনান্বিতা' এবং পূর্বকারণাগমে তাঁকে 'শ্বেতপদ্মাসীনা' বলা হয়েছে।

হংসবাহনা সরস্বতী : দেবী সরস্বতীর বাহন রূপে প্রায়শ হংসকেই দেখা যায়। সাধারণত দেখা যায়, যে পুরুষ দেবতার যে বাহন, তৎসম্পর্কিত স্ত্রীদেবতারও সেই একই বাহন। ব্রহ্মা হংসবাহন; ব্রহ্মাণী সরস্বতীরও প্রিয় বাহন হলো হংস। মানস-সরোবরের হংস চিরপ্রসিদ্ধ। কালিদাসের মেঘদূত থেকে শুরু করে বর্তমান কবিদের রচনায় মানস-সরোবরে হংস স্থান পেয়েছে। পুরাণাদিতে নির্দেশ আছে, সরস্বতী মানস-সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। সেজন্যই, বোধহয় হংসের সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক। আবার অনেকে মনে করেন, সরস্বতী নদী ছিল হংসদেব বিচরণভূমি। সেখান থেকেও সরস্বতী দেবীর বাহনরূপে হংস স্থান পেয়েছেন।

ময়ূরবাহনা সরস্বতী : দক্ষিণ ভারতের কিছু এলাকায় দেবী সরস্বতীকে ময়ূরবাহনা দেখা যায়। রাজপুতানাতেও ময়ূরবাহনা সরস্বতীর মূর্তি পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ক্যানিংহাম সাহেবের মতে সমস্ত প্রাচীন হিন্দু মন্দিরেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। এঁদের পৃথক পৃথক বাহন থাকে। গঙ্গার বাহন কুমির, যমুনার কচ্ছপ আর সরস্বতীর ময়ূর। ক্যানিংহামের মতে গঙ্গায় কুমিরের প্রাচুর্য, যমুনায় কচ্ছপের প্রাচুর্য এবং সরস্বতীর তীরে ময়ূরের আধিক্যবশত এইরূপ বাহন হয়ে থাকবে।

মেষবাহনা সরস্বতী : দেবী সরস্বতীর এক ধরনের মূর্তি পাওয়া যায়, যেখানে দেখা যায় পাদপীঠে একটি মেষ রয়েছে এবং দেবী মেষের পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণপদ স্থাপন করেছেন। দেবীর চারটি হাত। উপরের দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা; উপরের বাম হস্তে পুস্তক; নীচে দুটি হাতে বীণা ধারণ করে রয়েছেন।

সিংহবাহনা সরস্বতী : বৌদ্ধ মতের সরস্বতী সিংহবাহনা হন। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর শক্তি সরস্বতী, মঞ্জুশ্রীর বাহন সিংহ; সুতরাং তাঁর শক্তি সরস্বতীর বাহনও সিংহ হয়েছে। বোধগয়া থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ১৫ মাইল দূরে শোভনাথ পাহাড়।

১৮৯৯-১৯০০ সালে ওই পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানে একটি সরস্বতীর মূর্তি পাওয়া যায়। তাতে দেবী চতুর্ভুজা, তাঁর দুই হস্তে বীণা, অপর দুই হস্তে অক্ষমালা ও পুস্তক। সরস্বতী দ্বিদল পাদপীঠের উপর উপবিষ্টা, পাদপীঠের নীচে মধ্যভাগে একটি সিংহ। সিংহের উপর সুকৌশলে একটি পদ্ম বিন্যস্ত হয়েছে। সেই পদ্মের উপর দেবীর দক্ষিণপদ স্থাপিত। সিংহের বামদিকে একজন উপাসক যুক্তকরে বসে আছেন।

ব্রহ্মার শক্তি সরস্বতী : সরস্বতীর সঙ্গে ব্রহ্মার সম্বন্ধ কী? ঋগ্বেদ (১.১৬৪.৩৫) আলোচনা করলে এর একটি মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে— 'এই দেবীই পৃথিবীর অন্ত, এই যজ্ঞই ভূতজগতের নাভিভূত, এই সোমই সেচনশীল অশ্বের রেতঃ এবং এই ব্রহ্মা (ঋত্বিক) বাক্যের পরম স্থান।' এখানে ব্রহ্মার সঙ্গে 'বাক্'-দেবীর একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূচিত হয়েছে। বাক্-ই যে সরস্বতী, তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ। শতপথব্রাহ্মণে (৩.৯.১.৭) বলা হয়েছে— 'বাক্-ই সরস্বতী; তাঁর দ্বারাই প্রজাপতি পুনরায় নিজেকে আপ্যায়িত করলেন; বাক্ তাঁর দিকে ফিরে এলেন; তিনি বাক্-কে আত্মবশ করলেন। এই সময়ে তিনি বাক্যদ্বারা আপ্যায়িত হলেন, বলবান্ হলেন, বাক্ তাঁর নিকটে ফিরে এলেন, তিনি তাঁকে আত্মবশ করলেন।' বোধ হয়, এই ভাবেই আমরা দেবী সরস্বতীকে ব্রহ্মার স্ত্রীরূপে পেয়েছি।

সরস্বতী দেবীর মূর্তি ও উপাসনা ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের বাইরে জাপান (দেবী বেনজাইতেন), জাভা, বালি-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সমস্ত জায়গাতেই হতো এবং এখনো হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রাচীন ইউরোপে নর্স মিথোলজিতেও স্নোত্রা, উয়োর প্রভৃতি জ্ঞানের দেবীর কথা পাওয়া যায়।

গ্রিক দেবী এথেনার সঙ্গে সরস্বতীর অনেক মিল পাওয়া যায়। গ্রিক মিথোলজি মতে এথেনা সৃষ্টিকর্তা জিউসের শক্তিস্বরূপা। রোমানদের জ্ঞানের দেবী মিনার্ভাও বোধহয় সরস্বতীরই অনুকৃতি। মিশরীয়দের দেবী শেষৎ ছিলেন লেখার দেবী। তিনিও বীণাপাণি ও লেখনীহস্তা। অন্যদিকে, প্রাচীন আর্মেনীয় সংস্কৃতিতে অনহিত নামক এক দেবীর কথা পাওয়া যায় যিনি একইসঙ্গে জ্ঞান ও জলের দেবতা। এই একই নামে প্রাচীন পারসিক জরাথুস্ট্রীয় মতে পূজিত দেবীর কথাও পাওয়া যায়। তিনি শস্যসমৃদ্ধি, জল ও জ্ঞানের দেবতা। দেবীরূপা ও নদীরূপা সরস্বতীই কি অনহিত?

(লেখক রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে গবেষণারত)

বিদ্যাদেবী সরস্বতী

সপ্তর্ষি ঘোষ

সরস্বতী বিদ্যার্থীদের অন্যতম দেবী। শুধু হিন্দুদেরই নয়, জৈন ও বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের মধ্যেও মা সরস্বতী খুব জনপ্রিয়। ভারতের বাইরে তিব্বত, যবদ্বীপ, জাপান, রাশিয়া, আফগানিস্তানেও সরস্বতীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতিথিতে সরস্বতীপূজা আবহমানকাল থেকে ভারতবর্ষে প্রচলিত। এর সূচনাকাল সঠিক ভাবে নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও সরস্বতীপূজার প্রাচীনত্ব নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সরস্বতীপূজার দিনটি 'শ্রীপঞ্চমী' নামেও পরিচিত। বেদে 'সরস্' শব্দের একটি অর্থ জল। বৈদিক যুগে সরস্বতী ছিলেন নদীস্বরূপা। সরস্বতীর জল পরম পবিত্র বলে সমাদৃত ছিল। এই সরস্বতী নদীর তীরে প্রাচীন ঋষিরা বিভিন্ন দেবতার আরাধনা ও যাগ-যজ্ঞ করতেন। দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদে ভারতের ধর্ম, জ্ঞান, নীতি, শিল্পবিদ্যা বিকশিত হয়েছিল। এই সময় কৃষি-বাণিজ্যও ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল এবং তাদের সামাজিক জীবনও উন্নত হয়েছিল।

নদী হয়েও সরস্বতী বৈদিক যুগে জ্ঞান, কলাবিদ্যা, সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য— এই সমস্ত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ভারতবর্ষে পূজিতা। ঋগ্বেদে সরস্বতীর বিবিধ রূপ। তিনি মাতৃশ্রেষ্ঠা, তিনি নদীশ্রেষ্ঠা, তিনি দেবীশ্রেষ্ঠা। বৈদিক যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। সুতরাং বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতীর কর্ম ও মহিমার কথা উল্লেখিত হলেও তাঁর অবয়বের কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে যখন সরস্বতী দেবীর কল্পনা করা হলো, তখন তাঁর গাত্রবর্ণ জ্যোতির্ময় বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্যোতক শ্বেতবর্ণ কল্পিত হলো। সরস্বতী শ্বেতবর্ণা, শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্টা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, শ্বেতবর্ণের অলঙ্কারে বিভূষিতা, শ্বেত চন্দনে চর্চিতা তাঁর অঙ্গ এবং তাঁর বাহন হংসের বর্ণও শ্বেত। সরস্বতীর হস্ত ধৃত পুস্তক এবং বাদ্যযন্ত্র বীণাও শ্বেতবর্ণ। তাই তিনি প্রকৃত অর্থেই 'সর্বশুক্লা সরস্বতী'। সরস্বতী পূজার মন্ত্রে বলা হয় 'বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে'। বীণা সুরের প্রতীক এবং পুস্তক বেদের প্রতীক। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেবী সরস্বতী নিষ্ঠা সহকারে পূজিতা হন। □

সালোকসংশ্লেষেরও দেবী সরস্বতী

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

'সরস' শব্দের অর্থ জল। শুরুতে সরস্বতী ছিলেন জলের দেবী, নদীরূপে পূজিতা। শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর প্রধান ভূমিকা ছিল। বিদ্যার দেবীর ধারণা অনেক পরে। উর্বর নদী উপত্যকায় কৃষির ফলন ছিল পর্যাপ্ত। তাই সরস্বতী নদীতীরে ঋষিরা রূপদান করেছিলেন বৈদিক সংস্কৃতির। সেই সূত্রে জলের প্রত্যক্ষ দেবী কৃষি ও উর্বরতাকে ছাপিয়ে হয়ে গেলেন জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী। সভ্যতার অভ্যুত্থান ও তার ক্রমবিকাশে নদী সবসময় সহায়ক ভূমিকা পালন করে এসেছে। তাই কল্পনা করা যেতেই পারে সরস্বতী নদীর দু'কূলে সৃজিত পলল মৃত্তিকার উর্বর শস্যক্ষেত্র ছিল ঋষিদের 'শস্যাগার'।

আবার 'সরস' শব্দের অপর অর্থ 'জ্যোতি'। ঋগ্বেদে সরস্বতীকে পাওয়া যায় অগ্নিরূপ, জ্যোতির্ময়ী এক দেবী রূপে। সরস্বতীর মধ্যে সূর্যকিরণের সপ্তবর্ণের ধারণা এখানে পরিষ্কার। যেহেতু উদ্ভিদ দেহে বৃদ্ধি ও পরিস্ফূরণের অপরিহার্য শর্ত আলোক ও জল, সরস্বতী তাই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সৌরশক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাবে জলের আবর্তন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জলের সরবরাহকারিণী দেবী সরস্বতীর সঙ্গে তাই কৃষি উৎপাদনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

'শ্রী' অর্থে লক্ষ্মী। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে একসময় হয়তো লক্ষ্মীপূজাই হতো। এখনো অনেক পরিবারে দেবী সরস্বতীর সঙ্গে দেবী লক্ষ্মীকেও ভক্তি সহকারে ফুল নৈবেদ্য দেন। আর এই দিনটি থেকেই যেন শুরু হয় মুকুল-বিকাশের পর্ব, বসন্তের সৌকর্য, সুপ্তির অবসান, মনের মুক্তির মরশুম। দেবী সরস্বতী উপাসনায় লাগে পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব। ধান, যব, গম, মুগ, তিল দিয়ে এই পঞ্চশস্যের অর্ঘ্য রচিত হয় আর আম, অশোক, অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুমুরের বিটপ দিয়ে সাজানো হয় পঞ্চপল্লব।

পলাশপ্রিয়া হলেন দেবী সরস্বতী। পলাশের রক্ত রং উর্বরতার প্রতীক, আর ঋতুমতী নারীর রজোদর্শনই প্রাণীজন্মের প্রথম শর্ত। দেবী সরস্বতী তাই উর্বরতার অধিষ্ঠাত্রী রূপে পূজিতা, জলের দেবী, আলোর দেবী, উর্বরতার দেবী। □

হরপ্পার সমকালীন প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর প্রাচীন পাণ্ডুরাজার ঢিবি

দেবাশিস চৌধুরী

বাঙ্গালি রাতারাতি গজিয়ে ওঠা কোনো জাতি নয়, হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক তো বটেই বরং রামায়ণ মহাভারতের সময়কাল থেকে বাঙ্গালি জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান। প্রাচীন গ্রন্থে যেমন বঙ্গ ও বাঙ্গালির উল্লেখ আছে তেমনটি আবার গঙ্গারিডি সভ্যতা থেকেও প্রাচীনত্বের পুরাতাত্ত্বিক ইঙ্গিত মিলেছে। বিভিন্ন সময়কালের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে একে একে উন্মুক্ত হয়েছে ওই সভ্যতার এক একটি কেন্দ্র। যেমন উত্তর চব্বিশ পরগনার বেড়াচাঁপায় চন্দ্রকেতুগড়, ঢাকার নরসিংদীতে উয়াড়ি-বটেশ্বর বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবনের ব-দ্বীপ অঞ্চলে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। তবে লক্ষ্য করার বিষয় সবটাই কিন্তু গঙ্গানদীর পূর্বপাড়ে।

১৯৬০ সালের প্রথমদিকে পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় দপ্তরের প্রচেষ্টায় অজয়ের দক্ষিণ পাড়ে, অধুনা পূর্ব-বর্ধমান জেলায় খুঁজে পাওয়া গেল এক প্রত্নস্থল। এই আর্কিওলজিকাল সাইটটির অফিসিয়াল নাম 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি'। এই স্থানে ওই দপ্তরের তিনটি বাঁধানো ফলক থেকে জানা যায় এর প্রাচীনত্ব 1600BCE-1400BCE থেকে 800CE-1000CE পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিভিন্ন যুগের স্তর অনুযায়ী মোট ছয়টি স্তরের প্রমাণ পাওয়ার সঙ্গে আবিষ্কৃত হলো তাম্রাশ্মীয় যুগের জনগোষ্ঠীর পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের সঙ্গে ধাতুবিহীন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পাল-সেন যুগ পর্যন্ত প্রত্ন-নিদর্শন। তবে ধাতুবিহীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের পূর্বভারতীয় ক্ষেত্রের এই প্রত্নস্থলটি প্রাচীন হলেও গঙ্গানদীর পশ্চিমপাড়ে অবস্থিত মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী অঞ্চলের হাটপাড়া প্রত্নস্থলের তুলনায় নবীন। প্রসঙ্গত, একটি বিষয় জানিয়ে রাখা ভালো, ওই ফলকে এই স্থানটিকে অজয় নদের পূর্বপাড় বলে উল্লেখ করা হলেও গুগল-ম্যাপ অনুযায়ী অবস্থান দেখায় অজয়ের দক্ষিণ দিকে।

'কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র' নামে খ্যাত একটি বিশেষ ধরনের প্রত্ন-নিদর্শন হচ্ছে প্রাচীনত্বের বড়ো মাইলস্টোন। এই ঐতিহাসিক নিদর্শন স্বচক্ষে দেখার আশায় এক রবিবারের সকালে পাড়ি জমিয়ে ছিলাম। হাওড়া থেকে ট্রেনে বর্ধমান এসে একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে চললাম পাণ্ডু রাজার ঢিবি দেখতে। সময় লাগলো প্রায় ঘণ্টা খানেক। এখান থেকে বাঁহাতি রাস্তা ধরে পিচকুড়ির ঢাল রেলস্টেশনের লেবেল ক্রসিং পার হয়ে গ্রাম্য পিচের রাস্তা ধরে আরও প্রায় মিনিট চল্লিশের পর পৌঁছলাম পাণ্ডুক গ্রামে। মূল রাস্তার গায়েই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটি ঢালু মাঠ। মাঠে ঢোকার একটাই লোহার গেট। চারপাশ শুনসান, কোনো সিকিউরিটি গার্ডও নেই। বিনা বাধায় যে কেউ যখন খুশি ঢুকতে পারে।

ভেতরে এসে দেখা গেল অবহেলায় পড়ে থাকা একটা ফাঁকা মাঠ অতীতের খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্নগুলি বুকে নিয়ে মৃতদেহের মতো নিশ্চুপ-নিশ্চল। ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় খননকার্যের গর্তগুলি সময়ের নিয়মে আজ অনেকটাই বুজে এসেছে। ঝোপঝাড়ও গজিয়ে গেছে সেখানে। অতীতকালে শুধুমাত্র এই স্থানই নয় বরং একে কেন্দ্র করে বিশ-তিরিশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সভ্যতার শাখা প্রশাখা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার অভাবে নতুন করে আর বিশেষ কিছু সামনে আসেনি। কালের স্রোতে কিছু গল্প আর অনুমান নিয়েই দিন কাটাচ্ছে। সাধারণত প্রত্নস্থলের পাশাপাশিই মিউজিয়াম তৈরি করে সেখানেই প্রত্নসামগ্রীর একটা বড়ো অংশ প্রদর্শিত করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখান থেকে উদ্ধার হওয়া প্রত্নসামগ্রী গেল কোথায়? বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তার উলটোদিকের দোকাগুলিতে খোঁজ নিলাম। জানা গেল একটা সময় পর্যন্ত পাশের দীননাথপুর হাইস্কুলের একটি ঘরে প্রত্নসামগ্রীগুলি প্রদর্শিত হতো কিন্তু বর্তমানে তা স্থানান্তরিত হয়েছে বেহালার রাজ প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহালয়ে।

এখান থেকে ফিরে আসার কিছুদিন বাদে সুযোগ হলো বেহালায় আসার। ডায়মন্ড হারবার রোডে বেহালা মেট্রো স্টেশনের পাশেই মিউজিয়মটি। প্রবেশমূল্য মিটিয়ে ভিতরে এলাম। দোতলায় যে ঘরে চন্দ্রকেতু গড় থেকে উদ্ধার হওয়া প্রত্নসামগ্রী রাখা হয়েছে সেই ঘরের একটি খোপে দুটি ভগ্ন কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র রাখা রয়েছে। এছাড়া অপর আর একটি ঘরের খোপে রাখা হয়েছে দুটি পুতুলের মাথা। কোনো কোনো গবেষকদের মতে এই মাথাগুলি পুতুলের নয় তা মাতৃমূর্তির খণ্ডিত অংশ। মোট চারটি প্রত্নসামগ্রী ছাড়া পাণ্ডু রাজার ঢিবি থেকে উদ্ধার হওয়া বাদবাকি প্রত্নসামগ্রীর বিষয়ে মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষেরও কিছু জানা নেই।

নেতাজীর প্রত্যাবর্তন রুখতে চরিত্র হননের নীলনকশা

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

মধ্যরাতের স্বাধীনতার ভাষণে সেদিন উচ্চারিত হয়নি নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকারের নাম। খণ্ডিত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ভারতমায়ের মুক্তিসাধক হাজার হাজার স্বাধীনতা সৈনিককে স্মরণ করেননি। চেতনে কিংবা অবচেতনে জওহরলাল নেহরু নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কায় ভীত ছিলেন। কিছুদিন আগেই তাঁর ব্রিটিশ সুহৃদ মাউন্টব্যাটেন সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতটের কাছে দ্রুত নেতাজীর নির্দেশে গড়ে তোলা আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরগতিপ্রাপ্ত সৈনিকদের স্মৃতি তর্পণের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মারক স্তম্ভটি ডিনামাইট চার্জ করে ধ্বংস করে দেয়। আন্তর্জাতিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে বলিদানী সেনাদের প্রতি অপমান দেখেও সেদিন নেহরু মৃদু প্রতিবাদ পর্যন্ত করেননি। চুপিসারে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলিকে এই মর্মে যে 'আপনাদের যুদ্ধপরাধী সুভাষচন্দ্র বসুকে সোভিয়েত রাশিয়াতে স্তালিন আশ্রয় দিয়েছে যা একটি বিশ্বাসঘাতকতা'।

ব্রিটেনের ইন্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত যে চিঠির অফিস কপির সন্ধান মিলেছে কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত গোপন নেতাজী ফাইলে তাতে নেতাজী বিরোধিতার বহু তথ্য রয়েছে। আজাদ হিন্দ ফান্ডের অর্থসম্পদ লুঠ, নেহরু পরিবার ও ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি, নীলগঞ্জের সেনাব্যারাকে হাজার হাজার আজাদি সেনাকে গুলি করে হত্যার ঘটনাকে লঘু করে দিয়ে সত্য গোপন করা, নেতাজীর ও নেতাজী ঘনিষ্ঠদের ওপর গোপন নজরদারি চালানো, নেতাজীর তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনা একদা আত্মগোপনের জন্য নেতাজীরই সাজানো জেনেও লোকদেখানো শাহনওয়াজ কমিটি গড়ে দিয়ে বিমান দুর্ঘটনায় 'মৃত্যু ও চিতাভস্মে'র গল্পকে প্রতিষ্ঠা করার আজীবন মিথ্যাচারের সাক্ষী থাকে গোটা দেশ। সেনাবাহিনীর দপ্তরে নেতাজীর ছবি কিংবা আজাদি সেনাদের চাকুরি নিষিদ্ধ করার মতো অজস্র শত্রুতা নেহরু ও তাঁর দল দিনের পর দিন করেছে দেশবাসীকে অন্ধকারে রেখে। তবে সমস্ত কিছুকে পেরিয়ে গেছে নেতাজীকে জার্মান ফ্যাসিস্ট লিস্টে রাখার ষড়যন্ত্রে তাঁর ভুয়ো জার্মান স্ত্রী, প্রথমে পুত্র, পরে কন্যার গল্প প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার চক্রান্ত। এই কাজে বসু পরিবারের একাংশকে পরবর্তী সময়ে পাশে পেয়েছিলেন নেহরু। দীর্ঘমেয়াদি এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে ছিল নেতাজীর স্বনামে ভারত প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনার দুঃস্বপ্ন। এগারোটি দেশ নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। আজাদ হিন্দ সরকারের লড়াই ছিল শুধুমাত্র মার্কিন ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। ভারতের মহাফেজখানার তথ্য অনুসারে সোভিয়েত রাশিয়া নেতাজীকে সমর্থন দিয়েছিল। তাঁর সরকারের দূতাবাস খোলার অনুমতি দিয়েছিল রাশিয়া। আন্তর্জাতিক যুদ্ধপরাধীর আমেরিকার তৈরি ফ্যাসিস্ট তালিকায় নেতাজীর নাম অন্তর্ভুক্তিতে সায় দিয়েছিলেন নেহরু।

১৯৪৯ সালে সন্মার্গ হিন্দি দৈনিক পত্রিকায় একটি ছোট্ট খবর ছাপা হয় যে, জনৈকা এমিলি শেঙ্কলকে নাকি সুভাষচন্দ্র বসু বিবাহ করেছেন এবং তাঁর আট বছরের পুত্র সন্তান আছে। নেতাজীর মেজদা শরৎচন্দ্র বসু এই খবরে গুরুত্ব দিতে সকলকে বারণ করলেন।

এরপর তিনি ভিয়েনায় তথাকথিত এমিলির সঙ্গে দেখা করেন। দেখলেন অ্যানিটা নামের এক কন্যা, ছবি তোলা হলো। দমদম এয়ারপোর্টে নেমে শরৎচন্দ্র বসু সংবাদমাধ্যমের সামনেই বললেন তিনি ভিয়েনায় গিয়ে প্রবঞ্চিত হয়েছেন। ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্রের মেজদা শরৎ বসু হঠাৎ প্রয়াত হন। কিছুদিন পরে শরৎ বসুর স্ত্রী বিভাবতী বসুর ভাষ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতার খবর প্রকাশিত হলো— 'আমার অসম্পূর্ণ কার্য সম্পন্ন করুক আমার কন্যা'। শাড়ি পরিহিতা জনৈকা মহিলার ছবি এবং পাশেই 'মেজদা' শরৎ বসুকে বাংলায় লেখা একটি চিঠি। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ সালে এই চিঠি নাকি সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন। ওই পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি সেখানে বিবাহ করেছেন এবং কন্যা হয়েছে। তার অবর্তমানে যেন 'কন্যা' তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন এবং শরৎ বসু যেন সেই কন্যাকে দেখভাল করেন।

আশ্চর্যের বিষয়, বাংলা ভাষা নাজানা জনৈকা এমিলির হাতে চিঠি দিয়েছেন ৮

ফ ঃ ৫

তারিখ সাবমেরিন যাত্রার প্রাক্কালে। সম্প্রতি আরও একটি চিঠি দাবিদার পরিবারের তরফে প্রকাশিত হয়েছে যেটির তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি। চিঠিতে তাঁর স্ত্রী-কন্যার নাম-ধাম কিছুই উল্লেখ নেই। মেজদা শরৎ বসুকে লেখা নেতাজীর যাবতীয় চিঠি পাওয়া যায় তা ইংরেজি ভাষায়। একমাত্র ব্যতিক্রম ওই জাল চিঠিটি। জাল এই জন্য যে চারবার নানা বানান ও সুভাষচন্দ্রের স্বাক্ষর সংশোধিত হয়েছে যা খালি চোখেই দৃশ্যমান। দাবিদার পরিবারের সদস্যের লেখা বইগুলিতে তথাকথিত ওই চিঠিটি বিভিন্ন সময়ে ছাপা হয়েছে। একের পর এক বানান সংশোধনের পর। অবশেষে নেতাজী ভবনে সম্পূর্ণরূপে মহাজাল চিঠিটি দর্শকদের জন্য প্রদর্শিত হয়। নেতাজীর তথাকথিত 'স্ত্রী' এমিলিয়ের পাঁচ রকমের ছবি পাওয়া যায়। শরৎ বসুর পুত্রবধূ প্রাক্তন সাংসদ এমিলি ও সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে একটি বই লিখেন। সেখানে চারটি ছবি দেওয়া হয়েছে যেগুলি ১৯৩৭ সালে ডিসেম্বর মাসে তোলা হয়েছে বলে ছবি ক্যাপশানে আছে।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে চারটি আলাদা মুখাবয়বের 'এমিলি' এমনকী ১৯৩৫ সালে সুভাষচন্দ্রের স্টেনোগ্রাফারের যে এমিলির ছবি পাওয়া যায় তার সঙ্গে মিল নেই বাকি ছবিগুলির। ১৯৬০ সালে যখন উত্তরবঙ্গের শৌলমারী আশ্রমে স্বামী সারদানন্দ সন্ন্যাসীর অবস্থান নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয় সেই সময় দেশজুড়ে 'নেতাজী কন্যা অ্যানিটাকে' সফর করাতে ব্যস্ত হন নেহরু-বিধানচন্দ্রের কংগ্রেস। নেতাজীর মিথ্যা বিবাহ কাহিনি নানা আঙ্গিকে প্রকাশের জন্য কিছু বাঙ্গালি সাংবাদিককে মাঝে মধ্যেই পাঠানো হতো এমিলির কাছে। শিশির বসু ও তাঁর পুত্রের সম্পাদনায় নেতাজী রচনাবলীতে (সপ্তম খণ্ড) ভূমিকায় বলা হয়েছে নেতাজী নাকি ১৯৩৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর গোপনে এমিলিকে বিবাহ করেন। কিন্তু নেতাজী চীনে যাওয়ার ভিসার আবেদনপত্রে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন তিনি অবিবাহিত। তারিখ ছিল ২৩ নভেম্বর ১৯৩৯। শিশির বসুর পরবর্তীকালে বয়ান পালটেছেন এবং ১৯৪১, ১৯৪২ সালে বিবাহগল্প প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। বিশ্বের কোনো গোয়েন্দা সংস্থা, কোনো দেশ এই বিবাহ গল্প জানল না, কোনো গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে এই গল্প উপস্থাপিত হলো না, বিশ্বকে এই গল্প জানালেন শরৎ বসুর মৃত্যুর পর শুধু তার পরিবারের একাংশ। নেতাজীর দাদা সুরেশ বসু, ডাঃ সুনীল বসু, ভাইপো দ্বিজেন বসু কেউ ওই বিবাহের গল্প মেনে নেননি। নেহরু পরিকল্পিত নেতাজীর চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে আনার একমাত্র লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন জনৈকা বিদেশিনী অ্যানিটা ও দাবিদার পরিবারের একাংশ। এই চক্রের শিকড় অনেক গভীরে যা লিখলে আর এক মহাভারত হয়ে যাবে। কেন্দ্র সরকার প্রকাশিত নেতাজী ফাইলে অ্যানিটার জন্মের যে শংসাপত্র মিলেছে যেখানে স্পষ্ট যে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ওই মহিলা আইনগত কিংবা জিনগত ভাবে সম্পর্কযুক্ত নন। নেহরুর আমলে গোপন করা ওই বার্থ সার্টিফিকেটে শিশুকন্যার বাবার নাম নেই, মায়ের নাম জনৈকা ক্যারোলিন এমিলি শেঙ্কল।

নেতাজী তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জি কমিশনের একজন ডিপোনেন্ট হওয়ার সুবাদে এই প্রতিবেদকের অনেক নথিপত্র দেখার সুযোগ হয়েছিল। ১৯৭৯ সালের একটি নথিতে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে যে, তাদের কাছে কোনো খবর নেই নেতাজী কোনো বিদেশিনীকে বিবাহ করেছেন বা তার কোনো কন্যাসন্তান রয়েছে। আর একটি চমকপ্রদ তথ্য মিলেছে, জার্মান প্রবাসী দাবিদার পরিবারের সদস্য সূর্যকুমার বসুর পাঠানো একটি এফিডেভিটে। যেখানে তিনি কমিশনকে লিখেছেন যে অ্যানিটার রক্তের নমুনা যেন নেওয়া না হয়, কারণ অ্যানিটার জিন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে মিলবে না। 'ভস্ম' থেকে 'হাড়গোড়' হওয়া জাপানের বৌদ্ধমন্দিরে রক্ষিত ছাই ভস্ম এদেশে ফিরিয়ে আনতে নানা সময় আজও দাবি তোলা হয়। নেপথ্যে রয়েছে এক বড়ো চক্রান্ত। নেতাজী স্বনামে ভারত প্রত্যাবর্তন করলে তাকে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে নিকটজন দাবিতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা শনাক্ত করতেন। সেখানে শিশু-পুত্র কিংবা কন্যা কোলে জনৈকা এমিলি বিচারককে বলতেন ইনি আমার স্বামী নন, প্রতারক। প্রকৃত সুভাষচন্দ্রকে গোপনে শেষ করে দিলেও দেশবাসী জানতে পারতো না সত্য ঘটনা। কারণ নেহরু সরকার তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনা আর চিতা ভস্মের আড়ালে আগেই শেষ করে দিয়েছেন দেশবাসীর প্রিয় নেতাজীকে। এমিলি ও অ্যানিটার জন্য তৎকালীন ভারত সরকার গোপনে মাসিক ৬ হাজার টাকার ভাতা পাঠাত নিয়মিত। □

বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো মৌন কেন?

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

শরিয়তপুরে খোকনচন্দ্র দাস বা ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাসের ওপর নৃশংস হত্যা সেখানকার জেহাদিদের দ্বারা তৈরি কোনো বিভ্রান্তি থেকে বা গণরোষের হঠাৎ বিস্ফোরণের কারণে হয়নি। দু'জায়গাতেই ঘটনাক্রম ভয়ংকর রকমের স্পষ্ট ছিল; একদল লোক ভিড় জমিয়েছিল, কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তারপর পাশবিক অত্যাচার নেমে এসেছিল। দীপুচন্দ্র দাসকে গণপ্রহার করে অর্ধমৃত দেহটাকে গলায় দড়ি দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দেয়। আর খোকন দাসকে প্রথমে প্রহার করা হয় তারপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় এবং শেষে পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত সে হাসপাতালে মারা যায়।

খোকন দাসের উপর পাশবিক আক্রমণ বা দীপুচন্দ্র দাসের হত্যা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গত কয়েক সপ্তাহে হিন্দুদের নিশানা করে ঘটা একাধিক আক্রমণের খবর বেরিয়েছে বাংলাদেশ জুড়ে। রাজবাড়িতে অমৃত মণ্ডল নামে একজন হিন্দুকে আক্রমণ করে হত্যা করা হয়। তার আগে তার নামে গুজব রটানো হয়েছিল। ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাসের উপর একদল জেহাদি কোনো প্রকার যাচাই না করেই ইসলাম অবমাননার অভিযোগ এনে গণপ্রহার চালায়।

এগুলো কখনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে না। গত দেড় বছরে দখলদারি সরকারের শাসনকালে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে, গণপ্রহার করা হয়েছে, চাপাতির কোপ বসানো হয়েছে, ভয় দেখানো হয়েছে। মাঝে মাঝেই হিন্দুদের গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার বারেবারে অজুহাত দিয়েছে যে এগুলোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই; এইগুলো তুচ্ছ ঘটনা সব। আবার কখনো সাফাই দিয়েছে যে এই সব হচ্ছে আওয়ামি লিগ সমর্থকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক রোষের বহিঃপ্রকাশ।

এই ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র তো আছেই। কারণ এরকম কোনো একটা ঘটনা ঘটেনি। হিংসার পৌনঃপুনিক একটা ক্রম দেখা যাচ্ছে। খুব দ্রুত জেহাদি জনতা জড়ো হচ্ছে, কোনো সামাজিক বাধা দেখা যাচ্ছে না। আর তারপরেই হিংসা ছড়িয়ে পড়েছে চূড়ান্ত পাশবিক আকারে। বাড়ি-জ্বালানো হয়, হিন্দুরা পালিয়ে যায়। সেই উন্মত্ত জেহাদি জনতা তাড়া করে তাদের প্রহার করে। বৃহত্তর হিন্দু সমাজ ভয়ে কুঁকড়ে থাকে। আবার এর পরবর্তী ঘটনাসমূহও একইভাবে পৌনঃপুনিক আকারে চলতে থাকে, এলোমেলো ধরপাকড়, সরকারি আশ্বাস এবং তারপর সব চুপচাপ।

এই জেহাদি আক্রমণ জনমনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে। ভারত সরকার খোলাখুলিভাবে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর চলা নৃশংসতার বিষয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে এবং ঢাকাকে জোর দিয়ে তাদের দায়দায়িত্ব পালনের বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যও হত্যার নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছে এবং হিন্দুদের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। এগুলো সব প্রথামাফিক নথিভুক্ত করা প্রতিক্রিয়া যেখানে অপরাধের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় কর্মীসংগঠনগুলো ও হিন্দু সংগঠন এবং তার সদস্যরা এর থেকে অনেক বেশি মুখর হয়েছে। এই সমস্যাগুলো যাতে জনসাধারণের চোখের সামনে থেকে সরে না যায় বা হারিয়ে না যায় তার জন্য তারা প্রতিবাদ সংঘটিত করেছে, পুলিশকে সর্বশেষ খবর দিয়েছে, অপরাধীদের চিহ্নিত করেছে এবং সব ঘটনাগুলোর দলিল তৈরি করেছে।

যেটা খুব দৃষ্টিকটুভাবে চোখে পড়ে তা হলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর বিশেষত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচের মতো সংগঠনগুলোর নীরবতা। এই দুই সংগঠনই হামাস জঙ্গি দমনের সময় চটজলদি বিবৃতি জারি করেছে, বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেছে, আপৎকালীন আবেদন জানিয়েছে এবং ধারাবাহিক সংবাদ পরিবেশন করেছে। বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর আক্রমণ তাদের কোনো সাড়া জাগায়নি। এই বৈপরীত্য শুধু সাংগঠনিক স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিশ্বজোড়া যত তৎপর কর্মী আছেন তারাও নীরব রয়েছেন।

গ্রেটা থুনবার্গের মতো কোনো একজন মানবাধিকার আন্দোলনকর্মীও বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে হিন্দুদের উপর সংগঠিত আক্রমণ নিয়ে কোনো প্রকাশ্য বিবৃতি জারি করেনি। এরা কিন্তু গাজা বিষয়ক সমস্যায় ভীষণভাবে মুখর ছিল, খুবই তৎপর ছিল। এমনকী তারা

ভারতে কৃষক বিক্ষোভের মতো রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও মুখর ছিল। বিভিন্ন মহলে এদের প্রকাশ্য বিবৃতির কিন্তু এখনো যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। গ্রেটা কিন্তু এইসব নিষ্ঠুরতা নিয়ে একটাও ট্যুইট করেনি। একই নীরবতা দেখা গেছে অন্য কয়েকজন প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক কর্মীর ক্ষেত্রেও। তারা পৃথিবীর কোথাও কিছু ঘটলেই মানবাধিকার সংকট নিয়ে নিয়মিত মুখ খোলেন। এক্ষেত্রে আলাদা করে কোনো তদন্ত হয়নি। জরুরি ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী কোনো প্রচারাভিযান চালানো হয়নি। এবং কেউ কোনো নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ্য বিবৃতি জারি করেনি, যেখানে এসব হত্যার বিষয় নিয়ে সুসংহতভাবে কোনো আলোচনা বা নিন্দা করা হয়েছে। যখন বাংলাদেশের প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানে প্রধানত বাঁধাধরা ছাঁচেই আলোচনা করা হয়েছে। এমন কোনো সংকটের কথা বলা হয়নি যার জন্য নিরন্তরভাবে আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগের দাবি করা হয়েছে। এই তুলনাটা কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যখন সরকার ও স্থানীয় অসামরিক প্রশাসন স্পষ্টভাবে সব সমস্যার কথা বলে অথচ বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মানবাধিকার রক্ষীরা খুব সতর্কভাবে বা অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাতে মুখ খোলে, বিশেষত যখন তাদের অন্যত্র দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা আছে বলে আগে দেখিয়েছে তখন তাতে একটা অস্বস্তিকর কিন্তু যথার্থ প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। এখানে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন উঠে আসে। এটা দেখিয়ে দেয় যে, এরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, বেছে বেছে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচারাভিযান চালিয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে নীরবতা মানে এই নয় যে কেউ কোনো কথা বলেনি। এটা তার চেয়েও সূক্ষ্ম ও অধিক ফলদায়ী। উল্লেখযোগ্য হলো, বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতি গোটা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং তার ফলে বিষয়টির প্রতি আন্তর্জাতিক দুনিয়ার গুরুত্বদানের অভাব। বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুদের নিয়ে কেন কোনো তদন্তমূলক বিবরণ আন্তর্জাতিক স্তরের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি? সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ (অর্থাৎ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার)-এর ওপর প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করা যায়নি। বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশ ইস্যুতে সমর্থনদানকারীদের একজোট করা হয়নি। ওই দেশে হিন্দু নির্যাতন রুখতে জরুরি ভিত্তিতে কোনো সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদগুলি পরিবেশন করেনি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম। বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের খবর আন্তর্জাতিক স্তরে 'ব্রেকিং নিউজ' হওয়ার পরেও তার সম্প্রচার যাতে অব্যাহত থাকে, সেই বিষয়টির প্রতিও গুরুত্ব আরোপিত হয়নি। একটা চাঞ্চল্যকর খবর প্রথমে বের হয়, কিন্তু তা যদি চালিয়ে নিয়ে না যাওয়া হয় তবে তা জনস্মৃতি থেকে দ্রুত সরে যায়। এখানেও তাই করা হয়েছে এবং সেটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই করা চলছে। অন্যত্র জেহাদি আক্রমণের বিষয়ে বৈশ্বিক মানবতাবাদী সংগঠনগুলো যেভাবে সাড়া দেয় বা প্রতিক্রিয়া জানায়, তার সঙ্গে এটা একেবারেই মিলছে না। ওই সব ক্ষেত্রে আদালতের বিচারপ্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার আগেই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি নির্দিষ্ট উপসংহারে উপনীত হয়ে তা প্রকাশ করে দেয়। অর্থাৎ তারা নিজেরাই বিচারপ্রক্রিয়া সেরে ফেলে যা তারা করতে পারে না। মানবাধিকার রক্ষা সংস্থাগুলির মুখপাত্ররা ঘনঘন টাটকা খবর দিতে থাকে এবং এইসব হিংসাত্মক ঘটনার কারণ হিসেবে দেখাতে চায় যে, জেহাদিরা নয়, সংশ্লিষ্ট সরকারই এই ক্ষেত্রে দায়ী। এর লক্ষ্য শুধুমাত্র তথ্যের দলিল নির্মাণ নয়; সংশ্লিষ্ট সরকারের উপর লাগাতার শ্যেন দৃষ্টি রাখাও তাদের উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে সেই তৎপরতা কিন্তু কখনও দেখা যায়নি। বাংলাদেশ জুড়ে সংঘটিত এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলি সংক্ষিপ্তকালের জন্য মূলধারার সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে থাকে এবং তারপর আন্তর্জাতিক আলোচ্যসূচি থেকে তা সরে যায়। ক্রমাগত এই বিষয়গুলিকে সম্প্রসারিত আকারে উপস্থাপন না করলে কূটনৈতিক চাপ দুর্বল হয়ে যায়, জনস্মৃতি আবছা হয়ে যায় এবং নির্যাতিতের জীবন একটি ফুটনোটে পর্যবসিত হয়। একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা যদি সর্বস্তরে আলোড়ন না তোলে বা সংবাদমাধ্যম যদি সক্রিয় ভূমিকা পালন না করে, মানবাধিকার সংগঠনগুলি যদি প্রতিবাদে মুখর না হয়, তবে তো সেই দেশে এই ধরনের হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকবে। নাগরিকদের রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে না সংশ্লিষ্ট সরকার।

এই হত্যাগুলো কয়েকটি প্রশ্নের জন্ম দেয়। এটা ঠিক যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো বা স্বনামধন্য মানবাধিকার আন্দোলনকর্মীরা প্রতিটা হিংসার ঘটনায় সাড়া দিতে হয়তো বাধ্য নন। প্রশ্নটা হলো, বিভিন্ন ঘটনায় তাদের দ্বারা বেছে বেছে গুরুত্ব আরোপ করার প্রবণতা কেন? এটা তাদের সাংগঠনিক কাজের সর্বজনীনতার দাবিকেই নস্যাৎ করে। যখন কোনো হত্যাকাণ্ড, মানবাধিকার লঙ্ঘন বা সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা হয় পুলিশি তদন্তের অধীন, সেই সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের দ্বারা প্রকাশিত হয় নানা তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন এবং ঘটনাগুলির সত্যতা স্বীকার করে নেয় সংশ্লিষ্ট সরকার বা প্রশাসন, তখন সেই ঘটনাগুলির প্রতিবাদ যদি বৈশ্বিক সমর্থনপ্রাপ্ত না হয়, সেই ক্ষেত্রে এই বিষয়ে মানবাধিকার সংস্থাগুলির নীরবতা অবশ্যই প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে।

মানবাধিকার রক্ষা আন্দোলনের নৈতিক বল ক্ষীণ হয়ে যায় যখন এই ঘটনাগুলির প্রতি সংগঠনগুলির গুরুত্বদানের বিষয়টি কঠোরভাবে শর্তাধীন হয়ে পড়ে। যখন প্রতিক্রিয়া দান অথবা ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ কিছু ক্ষেত্রে হয় তাৎক্ষণিক, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে তা মেপে মেপে করা হয় বা একেবারে হয়ই না, তখন সেই সমর্থনের কোনো মূল্য থাকে না। নির্যাতিত বা তার পরিবারের জন্য এই বৈষম্য কিন্তু জ্ঞান চর্চার বিষয় নয়। এটা লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন ঘটনায় ন্যায়বিচার দানের বিষয়টি কি আদৌ গুরুত্ব সহকারে অনুধাবিত হচ্ছে, নাকি তাকে শুধু একটা পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা বা বিস্মৃত শিরোনামে পর্যবসিত করা হচ্ছে? বাংলাদেশের হিন্দুদের কোনো প্রতীকী সহানুভূতি দরকার নেই কিংবা কোনো সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদনে তাদের ওপর সংঘটিত নির্যাতনের ঘটনাগুলির কোনো ভাসা ভাসা উল্লেখের প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন রোধে আন্তর্জাতিক স্তর থেকে প্রয়োজন বাংলাদেশের সরকারের ওপর রীতিমতো চাপ প্রয়োগ।

অন্য সব ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে যেমন ধারাবাহিকতা ও গুরুত্ব-সহ আন্তর্জাতিক চাপ দেওয়া হয়, এক্ষেত্রেও তাই করতে হবে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ এইসব বিশ্বজনীন মানবাধিকারের বাণী শূন্যগর্ভ মনে হবে। □

ভারতের প্রতিবেশী দেশের রক্তে শাহজালাল

শ্যামল কান্তি মজুমদার

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল একজন লোককে গলায় দড়ি বেঁধে টেনে হিঁচড়ে এনে গাছে ঝুলিয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে উন্মুক্ত বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জনতা এবং একটু ভালো করে পরখ করলে দেখা যায় এরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ওরা হায়নার মতো উল্লাস প্রকাশ করছিল এবং আগুন যত তেজ হয়েছিল চারিদিকের জেহাদি ছাত্র জনতা তত বেশি অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন ওরা পৃথিবী জয় করে ফেলেছে একটা নিরীহ মানুষকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে। এর সঙ্গে ছিল আল্লাহু আকবর-সহ বিভিন্ন জেহাদি স্লোগান। কেউ কেউ ফেসবুকে লাইভ টেলিকাস্ট করেছিল। মনে হচ্ছিল সমগ্র পৃথিবীকে বলতে চাইছে আমরা ১৪০০ বছর আগের আরবের সংস্কৃতিতে অফুরন্ত আনন্দ উপভোগ করি এবং এতেই জীবনের সার্থকতা।

একটু খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল লোকটি সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজের নাম দীপুচন্দ্র দাস। তিনি ময়মনসিংহে একটা প্রাইভেট পোশাক কোম্পানিতে সাধারণ চাকরি করতেন এবং তাঁর প্রমোশন সহকর্মীরা সহ্য করতে না পেরে ইসলাম অবমাননার মিথ্যা কথা বাজারে রটিয়ে দেয়। পুলিশ হস্তক্ষেপ করে তাঁকে থানায় নিয়ে আসে। কিন্তু জেহাদ তথা শাহজালালের বিষাক্ত মনোবৃত্তি যে তাদের রক্তে, কে এই কথা অস্বীকার করতে পারে? থানা নিজের কাজ না করে তথা কোনো তথ্য প্রমাণ যাচাই না করে দীপুচন্দ্র দাসকে জেহাদিদের হাতে তুলে দেয়। এখানে রক্ষকই ভক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। এতে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, থানার লোকজন জেহাদি মানসিকতা পোষণ করে নতুবা দেশে কোনো আইন শৃঙ্খলা নেই। দ্বিতীয় কারণটাই বেশি শক্তিশালী মনে হচ্ছে, তা না হলে লাইভ টেলিকাস্টে এই নৃশংস, বর্বর, মর্মান্তিক, পাশবিকতা সমগ্র বিশ্বকে ওরা দেখাতে সাহস পেত না। এই নৃশংসতা তাদের আগের ঘটনাগুলিকেও হার মানিয়েছে। নবির আদেশে সবচেয়ে ভয়াবহ শাস্তি হয়েছিল Umm-Qirfa নামে একজন ইহুদি কবির দু'পায়ে দুটি উট বেঁধে বিপরীতমুখী দৌড় করা হয়েছিল, ফলে ওই কবি ছিঁড়ে দুই ভাগ হয়ে গেছিল। কিন্তু জীবন্ত মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারার ইতিহাস কোরান ও হাদিসে চোখে পড়ে না। মনে হচ্ছে 'The cornerstone of Islamic expansion is to fear them to death'— এই চিন্তাধারা এখানে কাজ করছে।

দীপুচন্দ্র দাসকে নৃশংসভাবে মেরে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে একজন সাধারণ শ্রমিক ছিল এবং জানা গিয়েছে ওই পরিবারের কারও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। এমনকী নেই কোনো WhatsApp account। বাবা পঙ্গু, মা অসুস্থ এবং সেই ছিল গোটা পরিবারের একমাত্র ভরসা। হিন্দুরা সমস্ত এবং তথা প্রাণীর ভিতরে ভগবানের স্বরূপ দেখে। এই কারণে হিন্দুরা সচরাচর প্রত্যাঘাত করে না। যাকে জেহাদিরা জীবন্ত আগুনে জ্বালিয়ে দেয়, সে তো ছিল তাদেরই প্রতিবেশী। তারা একসঙ্গে বড়ো হয়েছিল, ঘুম থেকে উঠলেই একে অপরের মুখামুখি হতো। মূল পার্থক্য ছিল শাহজালাল বা তার উত্তরসূরীরা সমস্ত হিন্দুকে আরবের সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করতে পারেনি। তাদের পূর্বপুরুষও হিন্দুই ছিল। এই জেহাদিদের চেহারাটা আয়নায় দেখলে তাদের চেহারা যাকে তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেই দীপুচন্দ্র দাসের সঙ্গে মেলে, নাকি সৌদি আরবের Prince Mohammad bin Salman or কুয়েতের Price Mubarak AI-Sabah অথবা কাতারের Hamad AI Thani-র সঙ্গে মেলে? বাংলাদেশি মুসলমানদের এই সত্যটা স্বীকার করতে মোল্লারা কোনোদিনই দেবে না। আজ যে কাজটা একজন প্রতিবেশী ভাইয়ের সঙ্গে জেহাদিরা করল, সেটা কি একজন আমেরিকান, এক জন ইহুদি, একজন চীনা, একজন অস্ট্রেলিয়ান বা একজন সৌদি আরব, কাতার, কুয়েতের লোকের সঙ্গে তারা করতে পারবে? জেহাদিরা জানে যে, ওদের পুড়িয়ে মারলে ওরা শুধু জেহাদিদের হাতে ও ভাতে মারবে তা নয়, তাদের পুরো দেশটাই ধ্বংস করে দেবে। অবশ্য এই কাজটা জেহাদিরা নিজেরাই করে চলেছে। একটা উন্নয়নশীল দেশকে কীভাবে ধ্বংস করতে হয় তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ বর্তমান বাংলাদেশ। এইটাই স্বাভাবিক, কারণ এই মুসলমানরা মোল্লাদের হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছে এবং এই মুসলমানরাও নিজেদের বিবেককে ব্যবহার না করে পুতুলের মতো নাচানাচি করছে।

পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ৫৭টি মুসলমান দেশ আছে। তাদের মধ্যে খনিজ সম্পদ তথা প্রাকৃতিক তৈল ও গ্যাস যে দেশগুলি বিক্রি করে তারা ছাড়া প্রতিটা দেশের বেশিরভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে এবং নিজেরাই একে অপরকে নিত্যদিন ধ্বংস করে চলছে। দিন দিন তারা ধ্বংসের সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। সিরিয়া, লিবিয়া, সোমালিয়া, ইয়েমেন, সুদান, কঙ্গো, ইরাক, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশের দিকে দেখলে দেখা যাবে, সেখানকার মা-বোনেরা নরকের জীবনযাপন করছেন যা আগামীদিনে বাংলাদেশের মা-বোনদের সঙ্গে হবে। মেয়েদের পড়াশোনা, চাকরিবাকরি, ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। মা-বোনদের জীবন কালো কাপড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই এই ধ্রুব সত্যটা মেনে নিতে চাইছে। কারণ তারা জান্নাতি হতে চায়। কিন্তু গত ১৪০০ বছরে কেউ কি জান্নাতে প্রবেশ করছে? না, এখন পর্যন্ত কেউ করেনি। কারণ কেয়ামত আসেনি। যে তারিখগুলো দেওয়া ছিল কোরান তথা সহি বুখারীর হাদিসে সব তো ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যদি ভবিষ্যতে জেহাদিরা কেয়ামতের স্বপ্নও দেখে, তবে ওদের কী হবে যাদের কবরগুলো গত ১৪০০ বছরে প্রাকৃতিক কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে? কারণ এদের তো কিছুই অবশিষ্ট নেই। □

দুই হাঁস ও কচ্ছপ

এক জলাশয়ে এক কচ্ছপ বাস করত। গলাটি তার শাঁখের মতো। তাই তার নাম কম্বুগ্রীব। যে জলাশয়ে বাস করত সেখানে তার দুটি হাঁস বন্ধু ছিল।

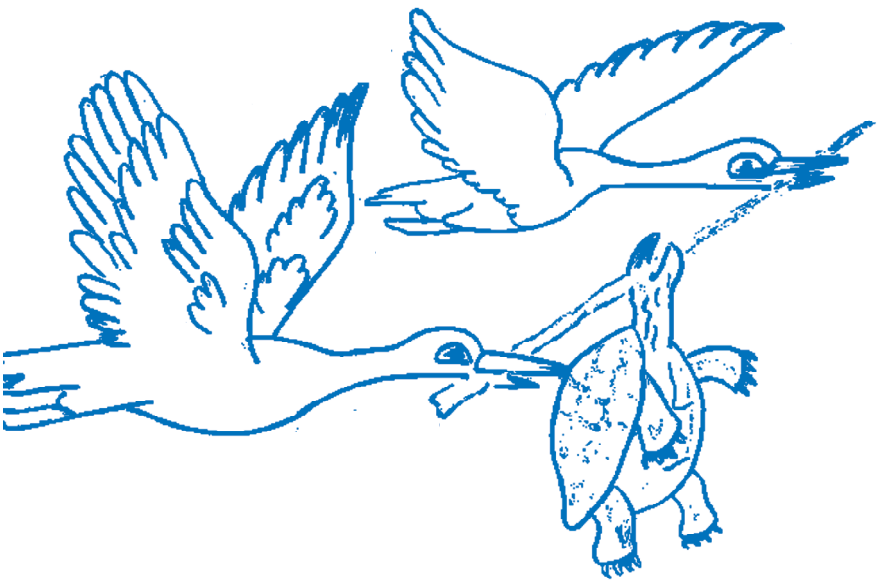

তাদের একটার নাম সঙ্কট, অন্যটির নাম বিকট। সময় সুযোগ পেলেই তারা একসঙ্গে বসে গল্পগুজব করে দিন কাটাত।

দিন এভাবেই কেটে যাচ্ছিল কম্বুগ্রীবের। একবার হলো কী, সে বছরে একফোঁটাও বৃষ্টি হলো না। পুকুর, হ্রদ, জলাশয়ের জল শুকিয়ে গেল। কচ্ছপ যে জলাশয়ে বাস করত তার জলও শুকিয়ে গেল। সে পড়ল মহাবিপদে। প্রাণটুকু টিকিয়ে রাখা দায়।

বন্ধুর দুঃখ দেখে হাঁসবন্ধুদের মনেও কষ্ট হলো। কীভাবে এই বিনাশের হাত থেকে কচ্ছপ বন্ধুকে বাঁচাবে, তা ভেবে উঠতে পারল না।

একদিন সঙ্কট আর বিকট বলল—বন্ধু, জল শুকিয়ে কাদা দেখা যাচ্ছে। তোমার কথা চিন্তা করে আমাদের চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেছে।

কম্বুগ্রীব বলল—বন্ধু, জল না থাকলে একদিন মরতেই হবে। তবু বাঁচার একটা পথ বের করতে হয়। সমুদ্রে জাহাজ ডুবতে শুরু করলে যাত্রীরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য সাঁতার কাটে। তাই মুষড়ে না পড়ে আমাদের ভাবতে হবে কী করে এই বিপদ থেকে বাঁচা যায়। বন্ধু বিপদে পড়লে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরাই এগিয়ে আসে। সাহায্য করে যথাসাধ্য।

কম্বুগ্রীব বলল—বুদ্ধি থাকলে সব হয়। আমি একটা বুদ্ধি ভেবেছি, তোমরা কেবল আমাকে সাহায্য করবে। তোমরা একটা জলাশয়ের খোঁজ কর, যেখানে প্রচুর জল আছে। আর নিয়ে এস একটা শক্ত অথচ হালকা লাঠি। আমি লাঠির মাঝখানটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে থাকব আর তোমরা দুজনে লাঠির দুদিকে ঠোঁটে চেপে আমাকে উড়ে নিয়ে যাবে ওই জলাশয়ে।

সঙ্কট বলল, বাঃ, দারুন বুদ্ধি, দারুন পরিকল্পনা!

বিকট বলল, বুদ্ধিটা মন্দ নয়, কিন্তু একাজে বিপদ আছে। উড়ে নিয়ে যাওয়ার সময় তুমি যদি কোনোভাবে কামড় আলগা করে ফেল, তাহলে আর রক্ষে নেই। নীচে পড়ে মারা যাবে।

কম্বুগ্রীব বলল— না না, এনিয়ে তোমরা চিন্তা করো না। আমি সেদিকে খুব হুঁশিয়ার। তোমরা কাজ শুরু করে দাও।

অতএব, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হলো। এক টুকরো কাঠের মাঝখানে কচ্ছপকে ঝুলিয়ে নিয়ে হাঁসদুটি আকাশে পাড়ি দিল। বন, প্রান্তর, পাহাড় পার হয়ে তারা এক শহরের উপর দিয়ে চলল। দুটি হাঁস একটি কচ্ছপকে আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে— এমন দৃশ্য দেখে নীচের লোকজনেরা হই-হই করে উঠল। নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল।

নীচে কীসের শব্দ, সেটা জানার জন্য কচ্ছপ ভাবল বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করবে। যেই না মুখ আলগা করেছে, অমনি পাক খেতে খেতে কচ্ছপ সোজা মাটিতে এসে পড়ল। তারপর আর কী! সেখানেই কচ্ছপের মৃত্যু হলো।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

পিন ভ্যালি

পিন ভ্যালি জাতীয় উদ্যান হিমাচল প্রদেশের লাহৌল ও স্পিতি জেলার স্পিতি উপত্যকা এবং কিন্নৌর জেলার ভাবা উপত্যকায় অবস্থিত। এটি শীতল মরুভূমির একটি অংশ। এর আয়তন ৬৭৫ বর্গকিলোমিটার। তুষারাবৃত অত্যুচ্চ স্থান ও ঢালের কারণে এই উদ্যানে তুষার চিতাবাঘ, সাইবেরিয়ান আইবেক্স, হিমালয়ান নীল ভেড়া, লাল শেয়াল, ওয়েসল, মার্টেন ও পিকা-সহ বেশ কয়েকটি বিপন্ন প্রাণীর আবাসস্থল। উদ্যানের উচ্চতা এবং চরম তাপমাত্রার কারণে এখানে গাছপালার ঘনত্ব খুবই কম। শুধু হিমালয়ান দেবদারু ও আলপাইন গাছ দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে উদ্যানে ফুল ফুটলে হিমালয়ান স্নোকক, চুকার তিতির, স্নো তিতির, ফিঞ্চ ও চাউফের পাখি দেখা যায়। সাধারণত মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এখানে ভ্রমণ করা যায়।

এসো সংস্কৃত শিখি-৯৭

অধঃ (নীচে)
দেবালয়স্য অধঃ গর্ভগৃহম্ অস্তি।
মন্দিরের নীচে গর্ভগৃহ আছে।
অভ্যাস কুর্মঃ –
ভবনস্য অধঃ আপণঃ অস্তি।
দীপস্য অধঃ অন্ধকারঃ অস্তি।
দণ্ডদীপস্য অধঃ কীটাঃ অস্তি।
সোপানস্য অধঃ দ্বিচক্রিকা আস্তি।
প্রযোগং কুর্মঃ --
অধঃ দ্বারা বাক্যাণি রচযাম
(অধঃ দ্বারা কয়েকটি বাক্য রচনা করবো)

যোগাযোগ–

(১) শ্রী সন্তু দত্ত, সংস্কৃতভারতী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক। ৯৮৭৪৬৮০৩১৩।
(২) শ্রী জয় সাহা,সংস্কৃতভারতী, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক। ৭৫০১৪৩৮৯৪৯।

ভালো কথা

আমার সাইকেল চালানো শেখা

আমার বাবা আমাকে অনেক আগেই সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন কিন্তু পড়ার চাপে অভ্যাস করাই হচ্ছিল না। এবার অক্টোবর মাসে শাখার অনেক আগে মাঠে এসে বাবা আমাকে সাইকেল চালানো শেখাতে লাগলেন। বাবা সাইকেলের পেছনে ধরে থাকতেন আর আমি প্যাডেল করতাম। প্রথম প্রথম পারতাম না। একবার প্যাডেল করলেই পরে যেতাম। তখন বাবা বকতেন আর বলতেন তোর দ্বারা কিছু হবে না। তখন দেবুদা এসে আমাকে সাইকেলে বসিয়ে জোরে ঠেলে দিত আর আমি প্যাডেল করতাম। তবে একটু গিয়েই পড়ে যেতাম। মা বলতেন এই তো হচ্ছে। একমাস প্রতিদিন অভ্যাস করতে করতে একসময় শিখে ফেললাম। এখন আমি বেশ চালাতে পারি। আমাকে সাইকেল চালানো শেখাতে এসে আমার বাবাও স্বয়ংসেবক হয়ে গেলেন। এখন বাবাও প্রতিদিন শাখায় আসেন।

দীপমাল্য সাউ, পঞ্চমশ্রেণী, রাধা-মাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ন বি তা ল	(১) জা কু উ ল চ্চ ত
(২) তা ণ্ড ম ল	(২) স ই হা বি তি দ

৫ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর
(১) জন্মজয়ন্তী (২) জয়তিলক

৫ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর
(১) অবিচলচিত্ত (২) অমৃতসাগর

(১) হৃতিকা মণ্ডল, জয়শ্রী, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০। (২) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কল - ৪৯ (৩) শুভ হালদার, ১৮ মাইল, মালদা (৪) শ্রেয়া সরদার, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

কেনিয়ার পথে শুরু এক নতুন অধ্যায়

বিদেশে হিন্দু সংগঠনের বীজ বপন

মানস রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন দু'জন যারা একে অপরকে চিনতেন না, একই জাহাজে যাচ্ছিলেন বিদেশে। জাহাজের ডেকে একজন গুনগুন করে প্রার্থনার সুরে মগ্ন ছিলেন। অপরজন সেই সুর শুনে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেন—এই প্রার্থনা তিনি কোথায় শিখেছেন। কথোপকথনের সূত্রে জানা যায়, দু'জনেই ভারতীয় এবং সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।

এই ঘটনাটির কথা বিস্তারিত জানালেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত। তিনি গত ১৮ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে এসেছিলেন সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দুটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সেখানে তিনি অংশগ্রহণকারীদের বহু প্রশ্নের উত্তর দেন। সেই প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি ছিল—

ভারতের বাইরে হিন্দু সংগঠনের কাজ কীভাবে প্রসারিত হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে সরসঙ্ঘচালকজী বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ মূলত ভারতের মধ্যেই কাজ করে—বিদেশে হিন্দু সংগঠনের কোনো পরিকল্পনা শুরুতে ছিল না। তবে ১৯৪৬ সালে গুজরাতের একজন স্বয়ংসেবক এবং পঞ্জাবের একজন স্বয়ংসেবক জাহাজে করে আফ্রিকার মুম্বাসা উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। পঞ্জাবের ওই স্বয়ংসেবকের প্রতিদিন শাখায় প্রার্থনা করার অভ্যাস ছিল। তাই সন্ধ্যার আগে তিনি জাহাজের ডেকে এসে ভারতের দিকে মুখ করে বুকে হাত দিয়ে প্রার্থনা শুরু করেন। তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে আরও একজন প্রার্থনা শুরু করেন। পরে জানালেন তিনিও একজন স্বয়ংসেবক। এইভাবেই কার্যত জাহাজের ডেকেই বিদেশে প্রথম শাখা শুরু হয়।

জাহাজযাত্রা শেষ হলে একজন মুম্বাসা নেমে যান এবং অন্যজন নাইরোবিতে চলে যান। তাঁরা নিজ নিজ স্থানে হিন্দু সমাজের মানুষদের একত্রিত করে শাখা শুরু করেন।

সরসঙ্ঘচালকজী আরও বলেন, ''একজন স্বয়ংসেবক কখনও শাখা ছাড়া থাকেন না। তিনি সর্বদাই শাখার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এইভাবেই বিদেশের মাটিতে সঙ্ঘের শাখার সূচনা হয়।''

তিনি জানান, কিছুদিন পর তাঁদের মনে হয় যে বিদেশে বসবাসরত হিন্দু ভাইদের নিয়ে শাখার যে সংস্কার পদ্ধতি রয়েছে, তা সে দেশের পরিবেশকে বিঘ্নিত না করেই প্রয়োগ করা সম্ভব। তখন প্রথমে 'ভারতীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' নামে সংগঠন শুরু হয়।

পরে উগান্ডা থেকে ভারতীয়দের বিতাড়িত করা হলে তাঁরা সবাই কেনিয়ায় চলে আসেন এবং সেখানে 'হিন্দু কাউন্সিল অফ কেনিয়া' গঠন করে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যান। এরপর অনেকে ইংল্যান্ডে চলে যান। প্রথমে সেখানে সংগঠিত কার্যক্রম তেমন ছিল না, কিন্তু পরে উৎসাহ বাড়ে এবং কাজ শুরু হয় 'হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' নামে। এরপর মরিশাসে শুরু হয় 'মরিশাস স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ', বার্মায় 'সনাতন ধর্ম স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' এবং নেপালে 'মাতৃভূমি স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' নামে সংগঠন। পরবর্তীতে বহু দেশেই 'হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' নামেই সংগঠন শুরু হয়।

ফঃ ৬

পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক জানান, বিভিন্ন দেশের স্বয়ংসেবকরা পরে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, যেহেতু কাজের লক্ষ্য ও পদ্ধতি এক, তাই সংগঠনের নামও এক থাকবে। সেই অনুযায়ী সর্বত্র 'হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' বা 'এইচএসএস" নামেই সংগঠন চলবে। প্রতিটি দেশে স্থানীয় আইন অনুযায়ী সংবিধান তৈরি করে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারের অনুমতি নিয়ে সংগঠনগুলি নিবন্ধিত চ্যারিটেবল সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। যদিও আইনগত দিক থেকে তারা পৃথক, কিন্তু আদর্শ, কর্মপদ্ধতি ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

কাকতলীয়ভাবে জলপথে সেই পরিচয় থেকেই শুরু হয়েছিল সংগঠনের এক নতুন অধ্যায়। ধীরে ধীরে বিদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। পরবর্তীকালে নতুন প্রজন্মকেও এই সাংস্কৃতিক বন্ধনে যুক্ত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়। দেশের বাইরে রামকৃষ্ণ মিশন, ইসকন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-সহ বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ শুরু করেছে।

সেই সময় থেকেই বিভিন্ন দেশে হিন্দু সংস্কৃতি, বিশ্বমাতা'র ধারণা, যোগব্যায়াম প্রভৃতি সর্বজনীন বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ও বিকাশে সহায়তা দেওয়া শুরু হয়। এই কাজে 'সেবা ইন্টারন্যাশনাল'-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'বিভিন্ন দেশে স্থানীয় সমাজের পাশে থেকে দেশপ্রেম ও সমাজগঠনের কাজে সংগঠন গড়ে ওঠে অনেকটা সঙ্ঘের আদলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কলম্বিয়ার সংগঠন সঙ্ঘের অনুমোদিত না হলেও, ভারতীয় ভাবধারায় তাদের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিয়েছে। ঠিক একইভাবে, হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (এইচএসএস) সক্রিয় হয়ে ওঠে, পরবর্তীতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেস বিশ্বব্যাপী সফলভাবে কাজ শুরু করে।

একসময় ইংল্যান্ডে ভারতীয়, পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি নাগরিকদের এক পর্যয়ে ফেলা হতো। কিন্তু হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, ইউকে-র উদ্যোগে সেখানে হিন্দুদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৫ সালের পর থেকে সঙ্ঘের নানা সংগঠন বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিরন্তর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত নেপালে '১৯৬২ সালে ভারত–চীন যুদ্ধে পরাজয়ের পর শ্রীগুরুজী নেপাল গিয়েছিলেন। পশুপতিনাথ মন্দির দর্শনের পর রাজা ও বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। নেপাল আসলে ভারতের বাইরে নয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কমিটি গঠনের সময় নেপালের রাজা বীরেন্দ্র সেই কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন।'

'আজও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান। যেমন, দীপাবলির প্রভাব ওয়াশিংটন পর্যন্ত পৌঁছেছে—আলোয় আলোকিত উৎসবের দিনে সেখানে সরকারি ছুটি পর্যন্ত ঘোষণা হয়। এমনকী বারাক ওবামার স্ত্রী ভারতীয় যোগাভ্যাসে এতটাই অনুরাগী যে, প্রতি শুক্রবার চার্চে যাওয়ার পরিবর্তে সরকারি ব্যবস্থায় যোগ অনুশীলনের বিশেষ আয়োজন করেন।' এবং আজ ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতাসীন, তা বলাই বাহুল্য–এর পেছনে রয়েছে ভারতীয় প্রবাসীদের আশীর্বাদ ও অকুণ্ঠ সমর্থন। কথা প্রসঙ্গে জানা যায়, বিশ্ব বিভাগের গণবেশের রং আলাদা—কালো প্যান্ট ও সাদা শার্ট। ইউরোপের দেশগুলিতে সাধারণত সপ্তাহিক শাখা অনুষ্ঠিত হয়। মা-বোনেরাও সেখানে অংশগ্রহণ করেন। বিদেশ বিভাগের প্রার্থনা ভারতের তুলনায় কিছুটা আলাদা।

ভারতের প্রার্থনা—

নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে ত্বয়া হিন্দুভূমে সুখং বর্ধিতোহহম্।
মহামঙ্গলে পুণ্যভূমে ত্বদর্থে পততেষ কায়ো নমস্তে নমস্তে।।..

অন্যদিকে, বিশ্ব বিভাগের প্রার্থনা—

সর্বমঙ্গল মাঙ্গল্যাং দেবীং সর্বার্থ সাধিকাম্।
শরণ্যাং সর্বভূতানাং নমামো ভূমিমাতরম্।।
সচ্চিদানন্দরুপায় বিশ্বমঙ্গলহেতবে।
বিশ্বধর্মৈকমূলায় নমোহস্তু পরমাত্মনে।।
বিশ্বধর্ম বিকাশার্থং প্রভো সংঘটিতা বয়ম্।
শুভামাশিষমস্মভ্যম্ দেহি তৎ পরিপূর্তয়ে।।
অজয্যমাত্মসামর্থ্যাং সুশীলং লোকপূজিতম্।
জ্ঞানং চ দেহি বিশ্বেশ ধ্যেয়মার্গ প্রকাশকম্।।
সমুৎকর্ষ্যোস্তু নো নিত্যং নিঃশ্রেয়সসমন্বিতঃ।
তৎসাধকম্ স্ফুরত্বন্তঃ সুবীরব্রতমুজ্জ্বলম্।।
বিশ্বধর্মপ্রকাশেন বিশ্বশান্তিপ্রবর্তকে।
হিন্দুসংগঠনাকার্যে ধ্যেয়নিষ্ঠা স্থিরাস্তুনঃ।।
সঙ্ঘশক্তির্বিজেত্রীয়ং কৃত্বাস্মদ্ধর্মরক্ষণম্
পরমং বৈভবং প্রাপ্তং সমর্থাস্তু তবাশিষা।।
ত্বদীয়ে পুণ্যকার্যেস্মিন্ বিশ্বকল্যাণসাধকে।
ত্যাগসেবা ব্রতস্যায়ং কায়ো মে পততু প্রভো।

।। বিশ্বধর্ম কী জয়।।

ভারতের ক্ষেত্রে স্বয়ংসেবকদের প্রার্থনার বিশেষত্ব ভারতকে হিন্দুভূমি হিসেবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করা অর্থাৎ ভারতের রাষ্ট্রীয়তাকে হিন্দুত্বের সমার্থক বলা আর এই কারণেই ভারতে 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' যে হিন্দু সংগঠন তা আলাদাভাবে নামের মধ্যে প্রকাশ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভারতের বাইরে যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রীয়তা হিন্দুত্বের থেকে পৃথক বা মূল ভারতভূমির রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে বর্তমানে বিচ্ছিন্ন তাই বিদেশে 'হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' নামেই সঙ্ঘকাজ চলছে।

যেখানে ভারতের ক্ষেত্রে স্বয়ংসেবকরা 'ভারতমাতা কী জয়' বলে প্রার্থনা করেছে সর্ব উপাসনা পদ্ধতির সমন্বয়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ, সামাজিক ন্যায় ইত্যাদি বৈশ্বিক লক্ষ্যের পূর্তিতে হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতি শুধু সহায়ক নয় বরং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা যেমন পরিবেশ দূষণ, পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, নাগরিক কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীনতা ইত্যাদির নিরাকরণে হিন্দু জীবন পদ্ধতি দূরগামী সমাধান দিতে সক্ষম। তাই বিশ্ব ধর্মের জয়ের পথ হিন্দু সংগঠনের মাধ্যমে সুগম হবে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হিন্দুরা সংগঠিত হলে সেই দেশের প্রতি

কর্তব্যরত থেকে হিন্দুজীবন পদ্ধতির ধারক ও বাহক হয়ে বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আজ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষও সঙ্ঘের শাখার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। এটি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। এইচ এস এস-এর উদ্যোগে লন্ডনে ডাক্তার হেডগেওয়ারের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার নিজে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই সফলতার মূল কারণ সঙ্ঘের সহজ কিন্তু গভীর মন্ত্র—

'তুমি হিন্দু মানে, তুমি সবার বন্ধু। যেখানে থাকবে, একজন আদর্শ নাগরিক নাগরিক হিসেবে থাকবে।'

আশার কথা এই যে, বিদেশে জন্ম নেওয়া দ্বিতীয় প্রজন্ম ইতিমধ্যে সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে এগিয়ে আসছেন। বিশ্ব বিভাগের প্রধান কার্যালয় ভারতের নাগপুরে, যেখানে প্রতি বছর বিভিন্ন দেশের কর্মীরা ২৫ দিনের জন্য এসে তৃতীয় বর্ষের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও অনুশাসন সব দেশে একইরকম। উপসাগরীয় দেশগুলোতেও কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলিতে কাজের সুযোগ তুলনামূলকভাবে সীমিত, তবু ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় সঙ্ঘের কাজ বেশ ভালোভাবেই এগোচ্ছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খ্রিস্টজন্মের আগের সংস্কৃতি ও সভ্যতা আজ লুপ্তপ্রায়। সেইসব দেশের বয়স্করা একটি সংগঠনের মাধ্যমে তিন-চার বছর অন্তর ভারতে আসেন। তাঁদের উদ্দেশ্য—নিজেদের অতীত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল সূত্র অন্বেষণ করা। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের প্রাচীন আচারের সঙ্গে ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যের যে গভীর মিল তাঁরা খুঁজে পান, সেটিই তাঁদের কাছে সবচেয়ে আনন্দের।

বিশ্বের হিন্দু সংগঠনগুলোর সেবামূলক ও সাংস্কৃতিক যাত্রা

বিশ্বজুড়ে হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভিন্ন সাখা ও সহযোগী সংগঠনের হিন্দুত্বের আদর্শ, মানবসেবা ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে। আধ্যাত্মিক বিকাশ, সমাজকল্যাণ ও সংগঠনের শক্তির সমন্বয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলো এক বৈশ্বিক চেতনা গড়ে তুলেছে।

হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (ইউ কে)

১৯৬৬ সালে পূর্ব আফ্রিকা থেকে আসা হিন্দু অভিবাসীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (ইউকে)। ১৯৭৪ সালে এই দাতব্য সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত হয়। সংস্কার (আধ্যাত্মিক বিকাশ), সেবা (মানবতার কল্যাণ) ও সংগঠন (ঐক্য)—এই তিন মূলনীতিকে ভিত্তি করে যুক্তরাজ্যের বহুসাংস্কৃতিক সমাজে হিন্দু মূল্যবোধ ও জীবনদর্শনের প্রচারে সংগঠনটি কাজ করছে। বর্তমানে ১০০-রও বেশি শাখায় প্রতি সপ্তাহে প্রায় ২০০০ সদস্য যোগব্যায়াম, খেলাধুলা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অংশ নেন। সংগঠনটি চিন্ময় মিশন, আর্ট অব লিভিং, ইসকন ও স্বামীনারায়ণ সংগঠনের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছে।

সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ (এসএসভি) : নেতৃত্ব বিকাশের অর্ধশতাব্দী

হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (ইউ কে)-এর অন্যতম কর্মসূচি 'সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ' (এসএসভি) ২০২৫ সালে ৫০ বছর পূর্ণ করেছে। এবারের বার্ষিক অনুষ্ঠানে রেকর্ডসংখ্যক ৬০৫ জন অংশগ্রহণকারী ও ১৩৯ জন প্রবন্ধক যুক্ত হন। চার বছরব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগব্যায়াম, ধ্যান, সমাজসেবা, দলগত কার্যক্রম ও নেতৃত্বের পাঠ একত্রে শেখানো হয়।

কিশোর থেকে প্রবীণ—সব বয়সের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সেবা, শৃঙ্খলা ও চরিত্রগঠনের বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে এটি আজ এক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

সেবা ইন্টারন্যাশনাল : মানবতার বৈশ্বিক আন্দোলন

১৯৯৩ সালের লাতুর ভূমিকম্পের সময় মানবতার তাগিদে শুরু হয় সেবা ইন্টারন্যাশনালের যাত্রা। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—এই ভারতীয় দর্শনকে ধারণ করে সংগঠনটি বর্তমানে ২০টিরও বেশি দেশে কাজ করে চলেছে।

দুর্যোগ ত্রাণ সহায়তা ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, দক্ষতা উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও নেতৃত্ব গঠনের ক্ষেত্রে কাজ করছে তারা।

জাতিসঙ্ঘের উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেবা ইন্টারন্যাশনাল সমাজের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে অবদান রাখছে। সেবা ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে সম্পর্কিত যাঁর নাম প্রথমে আসে, তিনি হলেন রবিকুমার আইয়ার। তিনি সঙ্ঘের অখিল ভারত সম্পর্ক টোলির সদস্য। রবিকুমার আইয়ার ১৯৭০ সালে চেন্নাইয়ের মাদ্রাজ ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেন। কলেজ জীবনে তিনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর অখিল ভারত সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৯-৭০) ছিলেন।

১৯৭৫ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে সমাজসেবায় নিয়োজিত হন এবং সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি গুজরাতের যুবসমাজ ও মহারাষ্ট্রের উপজাতিদের মধ্যে কাজ করেছেন।

এরপর ১৯৮২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৩৬ বছর ধরে তিনি সেবা ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে ৪৫টি দেশে নিয়মিতভাবে ভারতীয় সমাজের সেবা করেছেন। এই সময় তাঁর সদর দপ্তর ছিল হংকং, ব্যাংকক এবং অস্ট্রেলিয়ার সিডনি। তিনি ৪০টিরও বেশি দেশে ৩০০-এর বেশি যোগ শিবির এবং ৫০০-এরও বেশি বৈদিক গণিত কর্মশালা পরিচালনা করেছেন, যা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেস : বৈশ্বিক ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম

২০১৪ সালে দিল্লিতে শুরু হওয়া ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেস (ডব্লিউএইচসি) এখন বিশ্ব হিন্দু সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে অর্থনীতি, শিক্ষা, রাজনীতি, গণমাধ্যম, নারী ও যুব নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। ২০১৮ সালে শিকাগো ও ২০২৩ সালে ব্যাংককে সফলভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সম্মেলন ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এর মূল লক্ষ্য—বিশ্বের হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে মানবতার কল্যাণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। বিশ্বজুড়ে এই সমস্ত সংগঠনের মূল লক্ষ্য এক—হিন্দু আদর্শে সমাজ ও মানবতার উন্নতি,

আধ্যাত্মিকতা, সেবা ও ঐক্যের এই দ্যুতি আজও বিশ্বজুড়ে হিন্দু সমাজের কর্মকাণ্ডকে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে।

সঙ্ঘের বিশ্বদৃষ্টি ও ভারতের ভূমিকা

সুনীল আম্বেকরের লেখা বই 'দ্য আরএসএস রোডম্যাপস টুয়েন্টি ওয়ান সেঞ্চুরি'-তে এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এর সারমর্ম হলো, বিশ্বের হিন্দু সংগঠনগুলোর সেবামূলক ও সাংস্কৃতিক যাত্রা। সঙ্ঘের দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্ব এক বিশাল পরিবার—'বসুধৈব কুটুম্বকম্' কেবল একটি প্রাচীন শ্লোক নয়, বরং মানবজাতির একতার মূলমন্ত্র। এই ভাবনাই সঙ্ঘের আন্তর্জাতিক কর্মকৌশলের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কোনও রাজনৈতিক আধিপত্য বা ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপরে দাঁড়িয়ে নয়; বরং সহযোগিতা, শান্তি, মানবিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক আত্মীয়তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা উচিত।

ভারতের প্রাচীন দর্শনে যেমন বলা হয়েছে—'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ', তেমনই সঙ্ঘ বিশ্বাস করে, ভারতের আত্মা বিশ্বকল্যাণে নিবেদিত। সঙ্ঘের বক্তব্য অনুযায়ী, ভারতের বিশ্বচেতনা রাজনীতি নয়, বরং সাংস্কৃতিক ঐক্যের বার্তা বহন করে। বুদ্ধের অহিংসা ও ভগবদ্গীতার কর্মযোগ আজও পৃথিবীর নানাদেশে ভারতীয় চিন্তনের দূত হয়ে আছে। সঙ্ঘ মনে করে, এই বার্তাগুলিই ভারতের সবচেয়ে বড়ো বৈদেশিক সম্পদ।

চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়েও সঙ্ঘের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। তাদের মতে, ভারত ও চীন দুই প্রাচীন সভ্যতার ধারক— যাদের সম্পর্ক কেবল সীমান্ত বা বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রাচীন সাংস্কৃতিক বিনিময়ে গভীরভাবে যুক্ত। শতাব্দী আগে চৈনিক ভিক্ষুরা যেমন ভারতে এসে বৌদ্ধমত ও সংস্কৃতি শিখেছিলেন, তেমনই তারা সেই জ্ঞান তাদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। সঙ্ঘের মতে, এই প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত হলে দুই দেশের সম্পর্ক আরও মানবিক ও স্থিতিশীল হবে।

ভারতের ইতিহাসে বাণিজ্য ও সংস্কৃতি বরাবরই হাত ধরাধরি করে চলেছে। ভারতীয় বণিকেরা যখন দূরদেশে যেতেন, তখন তাঁরা শুধু দ্রব্য নয়, নিয়ে যেতেন বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও মানবতার বার্তা। তাদের পেছনে যুদ্ধের ধ্বনি নয়, বরং শান্তির প্রার্থনা সুর ধ্বনিত হতো। ভারতীয় নাবিকেরা ভারত মহাসাগর ঘিরে যে বাণিজ্যপথ তৈরি করেছিলেন, তার মধ্য দিয়েই ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছে গিয়েছিল—যা আজও সেইসব অঞ্চলে প্রতিফলিত।

সঙ্ঘের মতে, প্রতিটি দেশকে আত্মনির্ভর হতে হবে, তবে সেই উন্নয়ন যেন অন্যের ক্ষতির কারণ না হয়। ভারতের এই ভারসাম্যপূর্ণ নীতিই আজ বহু উন্নয়নশীল দেশকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। বিশেষত, যেসব দেশ চীনের আগ্রাসী নীতি নিয়ে উদ্বিগ্ন, তাদের কাছে ভারত হয়ে উঠেছে শান্তি ও স্থিতির প্রতীক। তাই ভারত স্থল ও সমুদ্রপথে বন্ধুত্বপূর্ণ সংযোগ বৃদ্ধির ওপর জোর দিচ্ছে—প্রতিবেশী বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার এবং এশিয়ান দেশগুলির সঙ্গে এই সহযোগিতাই ভারতের অগ্রাধিকার।

বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়দের সঙ্ঘ বিশেষ মর্যাদা দেয়। প্রবাসীরা ভারতের সাংস্কৃতিক দূত—যাঁরা বিদেশের মাটিতেও ভারতীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছেন। সেই ভাবনা থেকেই জন্ম নেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (এইচএসএস)। এই সংগঠনগুলির লক্ষ্য একটাই—প্রবাসী ভারতীয়দের তাদের সাংস্কৃতিক শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখা এবং স্থানীয় সমাজে ভারতীয় মূল্যবোধের সুর রক্ষা করা।

১৯৬৬ সালে যুক্তরাজ্যে (ইউ কে) স্থাপিত এইচএসএস মূলত পূর্ব আফ্রিকা থেকে আসা হিন্দু অভিবাসীদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। আজ তা ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান দেশ-সহ বিশ্বের নানা প্রান্তে সক্রিয়। তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক কর্মশালা, যুব প্রশিক্ষণ ও সেবামূলক কার্যক্রম—যা স্থানীয় সমাজের সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের এক সেতুবন্ধন তৈরি করেছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন দেশ ও সমাজের হিন্দু প্রতিনিধিদের একত্র করে 'ধর্ম, সমাজ ও মানবতা'-র সাধারণ প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলেছে। এই সম্মেলনগুলিতে শিক্ষা, নারী নেতৃত্ব, সমাজসেবা ও ধর্মীয় সহনশীলতা নিয়ে ভাববিনিময় হয়। এর মূল মন্ত্র— 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'— যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়।

এছাড়া আন্তর্জাতিক সহযোগ পরিষদ এবং সেবা ইন্টারন্যাশনাল-এর মতো সংগঠনও সঙ্ঘের প্রেরণায় প্রবাসী ভারতীয় সমাজে মানবিক ও সামাজিক কাজ চালায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়, যেমন ২০১৭ সালের হিউস্টন বন্যায় সেবা ইন্টারন্যাশনালের তৎপরতা আন্তর্জাতিক প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এই সংগঠনগুলির লক্ষ্য কেবল সাহায্য নয়, বরং মানবতার এক নীরব বিপ্লব ঘটানো।

সঙ্ঘের মতে, ভারতের সত্যিকারের শকিত নিহিত আছে তার আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি ও সেবার চেতনায়। তাই সঙ্ঘ মনে করে, কূটনীতির চেয়ে সাংস্কৃতিক বিনিময়েই স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারে। কুম্ভমেলার মতো আয়োজনকে সঙ্ঘ কেবল ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে দেখে না; বরং বিশ্বের কাছে ভারতের আত্মার এক প্রতিফলন হিসেবে তুলে ধরে—যেখানে নানা জাতি ও দেশের মানুষ এসে ভারতের জ্ঞান, যোগ ও সেবার মর্ম বুঝে যায়।

সুনীল আম্বেকর তাঁর বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন, সঙ্ঘের ধারণা অনুযায়ী জাতিসঙ্ঘ আরও গণতান্ত্রিক হওয়া উচিত। বিশ্বকে কোনো একক ফোরামের মাধ্যমে চালানো সম্ভব নয়; একাধিক চ্যানেল প্রয়োজন। বিশ্ব কখনো একমুখী বা দ্বিমুখী হতে পারে না—এটি সর্বদা বহুমুখী থাকবে। প্রতিটি দেশের নিজস্ব প্রভাব ক্ষেত্র রয়েছে। মূল বিষয় হলো সম্পর্কের গুরুত্ব এবং পুরো বিশ্বকে সংযুক্তভাবে দেখা উচিত। কোনোপ্রকার উচ্চতা-নিম্নতার মাপকাঠি থাকা উচিত নয়। এভাবেই সংঘ কল্পনা করে বিশ্বশান্তি।

সঙ্ঘের লক্ষ্য তাই বিশ্বে ভারতের ভূমিকা নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা—এমন এক ভারত, যা শক্তিতে নয়, সত্যে নেতৃত্ব দেয়; যা জয়ের জন্য নয়, ঐক্যের জন্য লড়াই করে। সঙ্ঘের বিশ্বাস, ভারত যদি তার সংস্কৃতি ও মানবতার আলো ছড়িয়ে দিতে পারে, তবে গোটা বিশ্বই একদিন সেই আলোয় আলোকিত হবে। □

আইপ্যাক কর্তার বাড়ি থেকে ‘সবুজ ফাইল’ নিয়ে কেন পালালেন মুখ্যমন্ত্রী?

প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য

সেই ‘লাল ডায়েরি’র কথা মনে আছে? বছর কয়েক আগেও যেটা নিয়ে রাজ্যজুড়ে হইচই হয়েছিল। তার জের শেষ হওয়ার আগেই এবার আবার খবরে এল ‘সবুজ ফাইল’। ঘটনাচক্রে দুটি ঘটনাই ঘটেছে তৃণমূল জমানায়। দুই চিটফান্ড সংস্থা রোজভ্যালি এবং সারদা-র শীর্ষকর্তাদের কাছ থেকে ইডি বাজেয়াপ্ত করেছিল লাল রঙের দুটি ডায়েরি। সেগুলিতে ঠিক কী ছিল, তা জানা না গেলেও এটা জানা গিয়েছে ডায়েরি দু’টিতে কোটি কোটি টাকার লেনদেন, রাজনৈতিক সংযোগ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম লেখা রয়েছে।

সময়ের শ্যাওলা লাগায় লাল ডায়েরির রং যখন ক্রমেই ফিকে হয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই চর্চায় চলে এলো সবুজ ফাইল। এবং সেই ফাইল সরিয়ে নিয়ে গেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবার আসা যাক আসল খবরে। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গত ৮ জানুয়ারি আইপ্যাকের অফিসে হানা দেয় ইডি। দিল্লির আর্থিক প্রতারণা মামলায় ওই সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের অফিস এবং লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি-র অভিযান শুরু হতেই দ্রুত প্রতীকের বাড়িতে পৌঁছে যান পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। হনহনিয়ে ঢুকে যান বাড়ির ভেতর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি যখন ওই বাড়ি থেকে বের হন, তখন তাঁর হাতে ধরা একটি সবুজ ফাইল। সেই ফাইলে কী রয়েছে তা জানাজানি হওয়ার আগেই সেটি চলে যায় তৃণমূল সুপ্রিমোর জিম্মায়। কেন তিনি সবুজ ফাইলটি সরিয়ে নিয়ে গেলেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধিরা। মুখ্যমন্ত্রী

ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন, তাহলে কি এই সবুজ ফাইলেই ভর্তি রয়েছে তৃণমূলের প্রাণভোমরা? সন্দেহের কারণ, অভিযান চলাকালীনই ইডি-র আধিকারিকদের মধ্যে দিয়ে হুস করে প্রতীকের ঘরে ঢুকে কেবল সবুজ ফাইলটি নিয়ে চলে যান মমতা।

বলেন, ‘প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি আধিকারিকরা, আই-টি ইনচার্জের বাড়িতে হার্ডডিস্ক সংগ্রহ করতে এসেছিল। সব প্রার্থীর তালিকা, পার্টির প্ল্যান, স্ট্র্যাটেজি সংগ্রহ করতে এসেছিল।’ তাঁর প্রশ্ন, ‘এটাই কি অমিল শাহের কাজ যার জন্য আমার দলের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছে?’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘দেশকেই রক্ষা করতে পারে না, আমার আইনি অফিসে ইডি হানা!’ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘একদিকে এসআইআর করে ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বা দিচ্ছে, প্রায় দেড় কোটি মানুষের নাম বাদ দিয়েছে। আর একদিকে এভাবে তল্লাশির মাধ্যমে দলের প্ল্যান হাতিয়ে নিচ্ছে।’ ফাইল সরানোর সাফাই গাইতে গিয়ে মমতা বলেন, ‘দেখুন, আমি সব এই ফাইলে করে নিয়ে এসেছি। কারণ, প্রতীক আমার পার্টির ইনচার্জ। সব হার্ডডিস্ক আমি গুছিয়ে নিয়ে এসেছি।’ কেন্দ্রীয় একটি তাদন্তকারি সংস্থার তল্লাশি অভিযানের সময় কেন মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গেলেন, কেনই বা তড়িঘড়ি করে সবুজ ফাইলটি নিয়ে চলে গেলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধিরা। নজিরবিহীন এই ঘটনায় তাজ্জব রাজ্যবাসী।

মমতা যখন সবুজ ফাইলটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, তখন তাঁর পিছু পিছু আরও বেশ কিছু ফাইলের গোছা নিয়ে বেরিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রীর রক্ষীরা। সেগুলি নিয়ে গিয়ে রাখা হয় মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িতে।

এদিন সল্টলেকে আইপ্যাকের দফতরে মমতা পৌঁছানোর ঢের আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-মন্ত্রীরা। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী এবং রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু। ভিআইপি লিফট্ না ধরে মুখ্যমন্ত্রী বেসমেন্টে গিয়ে লিফট্ ধরে সোজা চলে যান সেক্টর ফাইভের একটি বহুতলের ১১ তলায়। এই বেসমেন্টের সামনেই রাখা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি। সেই গাড়িতেই তোলা হয় সমস্ত ফাইল। সল্টলেকে যখন মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছান, তখন দেখা যায় গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের

পদস্থ কর্তারা। এই পুরো পর্বটি চলার সময়ের মধ্যেই ঘটনাস্থলে চলে আসেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারও।

আইপ্যাকের দফতরে তল্লাশি চালানোর সময় বহুতলটির প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ সিল করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। মুখ্যমন্ত্রী যখন সেখানে পৌঁছান, তখন দেখা যায় দুটি দরজাই বন্ধ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে বেসমেন্ট দিয়ে লিফটে চড়ে মুখ্যমন্ত্রী সটান চলে যান১১ তলায়, আইপ্যাকের দফতরে। ইডি-র দল আইপ্যাকের দফতরে যখন থেকে তল্লাশি শুরু করে তখন থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘিরে রেখেছিল এলাকাটি। তার পরেই সেখানে বাহিনী বাড়াতে শুরু করে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটও। মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়ে। পাল্লা দিয়ে বাহিনী বাড়ায় বিধাননগর পুলিশও।

যদিও তৃণমূলের আমলে এমনতর ঘটনা আগেও ঘটেছে। এবং রীতিমতো আসর জাঁকিয়ে বসে নয়া নাটকের অবতারণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। ২০১৯ সালে সারদা মামলায় তৎকালীন সিপি রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাউডন স্ট্রিটে হানা দিয়েছিল সিবিআই। কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের তৎকালীন পুলিশ কমিশনারের সরকারি বাসভবনে ঢুকতে বাধা দেয় কলকাতা পুলিশ। মমতা স্বয়ং লাউডন স্ট্রিটে গিয়ে সিপিকে নিয়ে চলে আসেন ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে। রাজীবের বাসভবনে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তল্লাশি অভিযানকে রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত বলে দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, ঘটনার প্রতিবাদে নবান্নের কাজকর্ম ফেলে সেই রাত থেকেই ধর্মতলার ধর্নায়ও বসে গিয়েছিলেন তিনি। ওই ধর্নায় যোগ দিয়েছিলেন রাজ্য সরকারের বেশ কয়েকজন 'কর্ত্রীভজা' পদস্থ আধিকারিক। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং যে অভিযোগের তল্লাশি করতে ইডি আসায় মুখ্যমন্ত্রীর এত নাটক, সেই নাটকে যোগ দিয়েছিলেন রাজীব নিজেও। ঘটনার জেরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। দেশের শীর্ষ আদালত রাজীব কুমারকে রক্ষাকবচ দেওয়ার পর ধর্না তুলে নেন মুখ্যমন্ত্রী। এই নাটকের কয়েক মাস পরেই গোটা দেশের সঙ্গে লোকসভার নির্বাচন হয় পশ্চিমবঙ্গেও। সেই ভোটে রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ১৮টি আসনে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। ২০২৬ সালের ৮ জানুয়ারিও ঘটনার কেন্দ্রে ফের সেই লাউডন স্ট্রিট এবং সেখানে হানা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-র তবে এবার অবশ্য নাটকের ধরণ বদলে নিয়েছেন তৃণমূলেশ্বরী। এবার আর ধর্নায় বসেননি তিনি। তবে গুচ্ছের পদস্থ পুলিশ কর্তার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে গিয়ে প্রতীকের বাড়ি থেকে সবুজ রঙের ফাইলটি নিয়ে চলে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে তাঁর নিরাপত্তা রক্ষী নিয়ে আসেন আরও বেশ কয়েকটি ফাইল। সব নিয়ে গিয়ে রাখা হয় মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িতে। তার পর হুস করে ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে যায় মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি। এর পরেই শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। কেন মমতা স্বয়ং কেবল সবুজ ফাইলটি বুকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে গেলেন? কেন তাঁর বিশ্বস্ত নিরাপত্তারক্ষী আরও কয়েকটি ফাইল নিয়ে চলে গেলেন? কি ছিল সেইসব ফাইলে? তাতে কী কোনো গোপন তথ্য ছিল, যা বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রকাশ্যে এলে বিড়ম্বনায় পড়তো রাজ্যের তৃণমূল সরকার? আপাতত এই সব প্রশ্নেই সরগরম চায়ের ঠেক কিংবা বনেদি বাড়ির কোনো রোয়াক।

প্রত্যাশিতভাবেই, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে ইডি। তারা আকর্ষণ করেছে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টিও। ইডি-র আধিকারিকদের বক্তব্য, তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে কয়লা পাচার মামলায় এই তল্লাশি অভিযান চলছে পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লির ১০টি জায়গায়। তার মধ্যে বাধা দেওয়া হয়েছে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের দুটি জায়গায় এবং দুটিই কলকাতায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সাংবিধানিক পদের অপব্যবহারের অভিযোগও তুলেছে ইডি। নির্বাচন কিংবা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই বলেও দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের।

তা সত্ত্বেও ইডি-র তদন্তে বাধা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। প্রশ্ন হলো, মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কাজে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ইডি-র তদন্তকারী আধিকারিকরা তাঁকে কেন বাধা দিলেন না? গুরুত্বপূর্ণ এই সরকারি সংস্থার লোকজনের সামনে থেকেই বা কীভাবে বিনা বাধায় ফাইল নিয়ে চলে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী? প্রশ্ন তুলেছেন সিপিএমের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, 'সরকারি কাজে বাধা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, আর ইডি তাঁকে কোনো বাধা দিল না! উনি গেলেন, ফাইল বের করে নিয়ে গাড়িতে তুললেন, গাড়ি আবার তৃণমূলের নামে নথিভুক্ত। কেন বাধা দিল না ইডি? স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর এহেন নজিরবিহীন কাণ্ডের অংশীদার কলকাতা ও বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার এবং রাজ্য পুলিশের বর্তমান ডিজি।' কংগ্রেসের তরফে আবার আইনি প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী বলেন, 'আইপ্যাক চাইলে আইনি সাহায্য নিতে পারত। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর ইন্টারেস্ট কী? রাজনৈতিক কোনো প্রতিহিংসা হয়ে থাকলে আইনি পথে লড়াই না করে তিনি কেন নিজে এগিয়ে এসে এই বেআইনি কাজ করলেন?'

ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন, তাহলে কি এই সবুজ ফাইলেই ভর্তি রয়েছে তৃণমূলের প্রাণভোমরা? সন্দেহের কারণ, অভিযান চলাকালীনই ইডি-র আধিকারিকদের মধ্যে দিয়ে হুস করে প্রতীকের ঘরে ঢুকে কেবল সবুজ ফাইলটি নিয়ে চলে যান মুখ্যমন্ত্রী। আর বাকি কয়েকটি ফাইল নিয়ে তাঁর রক্ষী রেখে এলেন গাড়িতে। এর অর্থ জলের মতো স্পষ্ট। এই সবুজ ফাইলেই রয়েছে নানান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। যে তথ্য প্রকাশ্যে এলে আদতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তৃণমূলই। রাজনৈতিক মহলের মতে, একের পর এক কেলেঙ্কারির পাঁক গায়ে লাগলেও তৃণমূল ছিল পরম নিশ্চিন্তে। নানা কৌশলে হাতে গরম বিভিন্ন ইস্যুর দিক থেকে বঙ্গবাসীর নজর ঘোরাতে কী নাই কী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার সবুজ ফাইল সরিয়ে রাজ্যবাসীর দৃষ্টি আরও একবার ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলো। অবতারণা হলো এক নয়া চিত্রনাট্যের, যে নাটকের যবনিকাপাত কবে হবে কিংবা আদৌ হবে কিনা, তার উত্তর পেতে লাগবে সময়। □

বঙ্গীয় নাট্যভাবনায় আশার আলো সঞ্চার

প্রবীর ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালির নাটকের ইতিহাস বহু প্রাচীন। কবে কোন সময় তেকে বাঙ্গালি নাট্যাভ্যাল শুরু করেছে এটা অনুমান করা খুব মুশকিল। শপ্তদশ শতকের শেষে রুশ সঙ্গীতশিল্পী লেবেদফের তৈরি 'বেঙ্গলি থিয়েটার'-এর হাত ধরে বাঙ্গালির মঞ্চনাটক শুরু হয়েছে— এই অবাস্তব ও মিথ্যা ইতিহাস থেকে বাঙ্গালি আজ মুক্ত হয়েছে। হতে পারে বাঙ্গালির নাটকের যাত্রা শুরু হয়েছিল কীর্তনের মঞ্চ থেকে।

বাঙ্গালির সঙ্গীতের দুটি ধারা লক্ষ্য করা গেছে। চর্যাপদে উল্লিখিত গৌড়ীয় সঙ্গীত পরবর্তীকালে ধ্রুপদ ও কীর্তনে বিভক্ত হয়। দ্বাদশ শতকে কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ এক অসাধারণ এক নাট্যাভিনয়। বাঙ্গালির পদাবলী ও লীলাকীর্তনে মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের চৌষট্টি কলাশাস্ত্র সমন্বিত নবরসের প্রকারভেদ দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বাঙ্গালির নবজাগরণের সূচনা হয়। সেই সময়ই সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্য, নৃত্য, বাদ্যের নবযাত্রা শুরু হয়।

বাঙ্গালির নাট্যইতিহাসের এই সংজ্ঞিপ্ত আলোচনা এজন্যই যে সম্প্রতি কলকাতা জাদুঘরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী সভাকক্ষে বঙ্গীয় নাট্যোৎসব২০০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। অভিনেত্রী রূপা গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে নয়াবাদ তিতাসের ব্যবস্থাপনায় রূপান্তর থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে দেখা গেল কলকাতার জাতীয়তাবাদী নাট্যদলের চারদিনের নাট্যোৎসব।

গত ৩ ডিসেম্বর উৎসবের সূচনা দিনে মঞ্চস্থ হলো একটিমাত্র নাটক দক্ষিণেশ্বর মন্দির পরিসরে যুবক গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে উঠার এক আখ্যানির্ভর অসামান্য নাটক 'দক্ষিণেশ্বর'। জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী সুটন চট্টোপাধ্যায় ও সহশিল্পীদের অপূর্ব সঙ্গীত ও অভিনয় দর্শকদের আপ্লুত করেছে। দক্ষিণ কলকাতার একটি প্রেক্ষাগৃহে আবেগে রোমাঞ্চে মহিলাদের মুহুর্মুহু উলুধ্বনি ও করতালি বাংলা নাটকের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বাঙ্গালি আজও আধ্যাত্মিকতার পথেই রয়েছে এই নাটক তার প্রমাণ।

উৎসহের দ্বিতীয় দিন ৪ ডিসেম্বর ছিল ৩টি নাটক— শুভাশিস খামারু ' প্রীতিলতা', ডঃ সুকমল মৈত্রের 'ভারতগাথা' এবং পাপিয়া অধিকারীর 'ঢপের চপ'। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় বঙ্গের বীর বীরাঙ্গনা বিপ্রবীদের জীবনকাহিনি-নির্ভর প্রথম দুটি নাটক। প্রহসনের মদ্যে দিয়ে সমাজের বাস্তব অবস্থাকে তুলে ধরার দুরূহ কাজটি করেছেন পাপিয়া অধিকারী তাঁর 'ঢপের চপ' নাটকে। গানে নাচে ৫০ মিনিটের এই নাটকে দর্শকদের মন ভরে গেছে। আমরাই পারি বজ্র হয়ে জ্বলতে।

৫ ডিসেম্বর উৎসব শুরু হয় ডঃ মোহন ঘোষের 'অন্ধকারে ঢেউ'-এর পরে শুভাশিস ব্যনার্জীর 'আগুনের চিঠি' এবং শেষে অমিত দে-র নাটক ' কেন চেয়ে আছ গো মা'। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান অন্ধাকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বাস্তর দলিল 'অন্ধকারের ঢেউ'। 'আগুনের চিঠি' নাটকে অগ্নিযুগের বিপ্লবী বীর যোদ্ধাদের প্রিয় মানুষদের উদ্দেশে লেখা ব্যক্তিগত চিঠি, যা আজও দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। বীরাঙ্গনা ননীবালা দেবীকে নিয়ে এক মর্মস্পর্শী নাটক সংস্কার ভারতীর 'কেন চেয়ে আছ গো মা'। এক ঝাঁক কিশোর এই নাটকের মূলশক্তি।

উৎসবের শেষদিনে ছিল ৩টি নাটক--- বীজ,যোজনগন্ধা ও অপাঙ্‌ক্তেয়। পাড়ায় পাড়ায় বিরিয়ানি ও হালাল খাবারের দোকান এবং জনবিন্যাস বদলে ফেলার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার আজ বাঙ্গালি। প্রবীর মণ্ডলের পরিচালনায় এবং আইনজীবী দেবজিৎ সরকারের অভিনয়সমৃদ্ধ এই নাটক। সঞ্জয় ঘোষদস্তিদার 'যোজনগন্ধা'য় দেখাতে চয়েছেন মহাভারতের সময়ে নারীর ক্ষমতায়ন। শেষ নাটক আবীরের পরিচালনায় নয়াবাদ তিতাসের 'অপাঙ্‌ক্তেয়'। সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয় মানুষেরাই কখনো সমাজের রক্ষক হয়ে ওঠে, এমনই কাহিনি নিয়ে এক অসামান্য ভাবনা ও অভিনয়সমৃদ্ধ নাটক।

কিংবদন্তী নট তথা নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, চন্দর সেন, সমীর বিশ্বাস, অনির্বাণ ভট্টাচার্য্য, সুমন ব্যনার্জী এবং আলোক শিল্পী বাদল দাস, শব্দশিল্পী হিমাংশু প্রা প্রমুখকে উৎসবের বিভিন্ন দিনে সংবর্ধনা জানানো হয়। বঙ্গীয় নাট্যোৎসব জাতীয়তাবাদী নাট্যভাবনায় নতুন আশার আলো সঞ্চার করল, এটা হলফ করে বলা যায়। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৫৬)

ধ্যেয়বোধ

ডাক্তারজী নিজে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ও সঙ্ঘের ভূমিকার মধ্যে যে পার্থক্য তা তিনি জানতেন। একসময় কংগ্রেস ও হিন্দুস্থানি সেবাদল সঙ্ঘের বিরোধিতা করেছিল। তাই বলে তিনি কখনো বৈরীভাব পোষণ করেননি। সঙ্ঘের ধ্যেয়বোধের কথা তিনি তাঁর আলোক পত্রিকায় এভাবে লিখলেন--- 'হিন্দু সংস্কৃতি হিন্দুস্থানের প্রাণ। তাই হিন্দুস্থানকে রক্ষা করতে হলে হিন্দু সংস্কৃতির রক্ষণই প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যদি হিন্দুস্থানের হিন্দু সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যায়, হিন্দু সমাজের চিহ্নমাত্র যদি দেশে না থাকে, তাহলে অবশিষ্ট ভূমিখণ্ডকে হিন্দুরাষ্ট্র অথবা হিন্দুস্থান বলা শোভনীয় হবে না। কারণ রাষ্ট্র কেবল ভূমির টুকরো নয়। একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষা করার প্রতি, হিন্দু সমাজের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের প্রতি কংগ্রেস আশ্চর্যজনকভাবে উদাসীন থেকেছে। এরফলে এই অত্যাবশ্যক কাজ করার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রয়োজন হয়েছে। তা সত্ত্বেও সঙ্ঘ কোনোভাবেই কংগ্রেসের বিরোধী নয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির পথে স্বাধীনতা লাভের কার্যক্রমে বাধাসৃষ্টি না করলে সঙ্ঘ কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং আজ পর্যন্ত তাই-ই করে এসেছে।'

কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করলে তা সর্বাংশে সমর্থন ও সহযোগিতার প্রেক্ষিতে প্রতিটি শাখায় ডাক্তারজী একটি জ্ঞাপনপত্র প্রেরণ করেন যা ছিল ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ — 'এই বছর কংগ্রেসের ধ্যেয়পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার দরুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করেছে যে, রবিবার ২৬ জানুয়ারি ১৯৩০, সমগ্র হিন্দুস্থানে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হবে। অখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সভা আমাদের স্বতন্ত্রতার ধ্যেয় স্বীকার করেছে। তা দেখে আমাদের অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক। এরূপ ধ্যেয় নিজেদের সামনে যে সংস্থাই রাখবে, তার প্রতি সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য। তাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমস্ত শাখা রবিবার, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৩০, সায়ংকাল ঠিক চারটার সময় নিজের নিজের সঙ্ঘস্থানে স্বয়ংসেবকদের মধ্যে সভা করে রাষ্ট্রীয় ধ্বজ অর্থাৎ গৈরিক পতাকার বন্দনা করবে। বক্তৃতায় স্বাধীনতার কল্পনা এবং প্রত্যেকের নিজের সম্মুখে এই ধ্যেয় কেন রাখা উচিত তা বিশদভাবে বলে এবং কংগ্রেস যে স্বাধীনতার ধ্যেয়কে স্বীকার করেছে, তারজন্য অভিনন্দন জানিয়ে যেন সমারোহ পূর্ণ করা হয়।' নিঃসন্দেহ এই পত্রটি ছিল ডাক্তারজীর উদার মানসিকতা, ধ্যেয়বোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও রাষ্ট্রভক্তির এক অনবদ্য দলিল।

(৫৭)

অর্থ হিসাব ও নীতিনিষ্ঠা

ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন পুনঃজাগ্রত ও গতিশীল হওয়ায় সঙ্ঘের ভূমিকা সম্পর্কে ইংরেজ শাসক কৌতূহলী ও সতর্ক হয়ে উঠল। স্থানে স্থানে পুলিশ স্বয়ংসেবকদের উত্যক্ত করতে লাগল। তারমধ্যে কার নেতৃত্বে সঙ্ঘ চলে, অর্থ কোথা থেকে আসে ইত্যাদি প্রশ্ন ছিল মুখ্য। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ডাক্তারজী বিভিন্ন শহরে স্বয়ংসেবকদের অভিভাবকরূপে একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি খুঁজে খুঁজে সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব দেন। তাঁদেরকেই অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে আর্থিক আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার অনুরোধ করেন। ডাক্তারজীর অভিমত ছিল, সার্বজনিক কাজের জন্য সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার অত্যন্ত উপযুক্ত কারণে করা উচিত। সংগঠনের প্রতিটি পয়সার হিসাব যথাযথভাবে লেখা উচিত। এই কাজে ডাক্তারজী তাঁর কাকা আবাজী হেডগেওয়ারের কাছে অনেক পথনির্দেশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ডাক্তারজীর এবিষয়ে একটি লেখা সুস্পষ্ট আলোকপাত করে— ' সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার দিন থেকে ১৯৩০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত হিসাব এমনভাবে পরীক্ষা করে তৈরি করা হয়েছে, যাতে কোনো সমালোচকও যেন তার মধ্যে কোনো দোষত্রুটি বের করতে না পারে।' একবার অল ইন্ডিয়া রিপোর্টারের সম্পাদক রাওসাহেব দাতারের কাছে ডাক্তারজী অর্থ সংগ্রহের জন্য কাউকে পাঠালে তিনি হিসাবের খাতা দেখতে চান। তাঁর কাছে হিসাবের খাতা পাঠিয়ে দিলে তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে হিসাব নিরীক্ষণ করেন এবং খুশি হন এই দেখে যে, সঙ্ঘস্থানে কুড়িয়ে পাওয়া একপয়সাও আয় হিসেবে দেখানো হয়েছে। তিনি অত্যন্ত প্রীত হয়ে খোলামনে দান করেন।

তখন সঙ্ঘের ঘোষ (বাদ্য) বাদন কলা সাধারণের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। এর ফলে ঘনিষ্ঠ অনেকেই তাদের পরিবারের উৎসবাদিতে সঙ্ঘের বাদ্য বাজাবার বায়না ডাক্তারজীর কাছে করত। অনেকের মত ছিল, কিছু পয়সা এর মাধ্যমে এলে ক্ষতি কী? ডাক্তারজীর পক্ষে হ্যাঁ বা না বলাটা মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো। এমন আবদার তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারতেন না। তাঁর মন বলত, স্বয়ংসেবকরা এক বৈভবময় ধ্যেয়ের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তাদের ঘোষবাদ্য শুধু সেই উদ্দেশ্যেই নিনাদিত হবে। একবার এক বন্ধু ছেলের বিয়েতে তাঁর বাড়িতে সঙ্ঘের ঘোষবাদ্য বাজানোর জন্য আগ্রহ করলে ডাক্তারজী তাঁকে বললেন, তোমার ছেলে যদি দেশের মুখ উজ্জ্বল করে আসত, তাহলে তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আমি স্বয়ং 'ঘোষ' নিয়ে যেতাম এবং ওই গৌরববৃদ্ধিকারী সুসন্তানের জন্য দশদিক ধ্বনিত করে দিতাম। কিন্তু তার বিবাহের জন্য তুমি যত টাকাই দাও না কেন, তাও সঙ্ঘের ঘোষ ওখানে বাজানো যাবে না।'

— সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস